কিয়ৎকাল গত হইল, জর্মনির রাজকুমারগণ কিরূপ প্রতিষ্ঠিত নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছিল এবং অনেকে তাহাতে আশ্চর্য্যভাবও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হই নাই, কারণ হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদিগকে সেই একই প্রকার সুপ্রতিষ্ঠ নিয়মে শিক্ষা দিবার কথা পূর্ব্ব হইতেই বিশিষ্ট সূত্রে অবগত ছিলাম। প্রত্যূষে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে বালিকা প্রতিভাসুন্দরীকে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের নামগ্রহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট কাল প্রধানত দৌড়াদৌড়ি ও পদচারণা দ্বারা শারীরিক ব্যায়াম সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইত; নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যায়ামে, নির্দ্দিষ্ট সময় সঙ্গীতাদিশিক্ষায়, নির্দ্দিষ্ট সময় চিত্রবিদ্যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠাভ্যাসে প্রতিভাসুন্দরী অবিচলিতভাবে নিযুক্ত থাকিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি গৃহে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র এবং উদ্ভিদবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা ও দেহতত্ত্ববিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। প্রতিভাসুন্দরী বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিখিয়াই নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই; তাঁহাকে গৃহে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ও ফরাশি প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করিতে হইত। তাঁহার পিতৃদেবের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে তিনি সর্ব্ববিষয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন। মনোবিজ্ঞান যখন বস্তুত অনাবিষ্কৃত একটী বৃহৎ জ্ঞানক্ষেত্র ছিল, হার্বার্ট স্পেন্সরের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকের সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়াতে তৎসম্বন্ধে আলোচনার বাহুল্য যখন ছিল না, সেই সময় হেমেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি বশত মনোবিজ্ঞানের অনুকূল শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনা দ্বারা তাঁহার কন্যার মনোবৃত্তিনিকর যাহাতে সম্যক্ পরিস্ফুট হয় এবং যাহাতে এতটুকুও মন্দপ্রবণতা না আসে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। মনস্তত্ত্ববিৎ সুপ্রসিদ্ধ সালি (Sully) অল্প বয়সে এইরূপ বিচিত্র শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সেরের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকেও মূলত এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধক শিক্ষাপ্রণালীরই সমর্থন দেখিতে পাই। আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি যে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে হেমেন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে এই আকাশের ন্যায় বিস্তৃত শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা কিরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল! একদিকে হেমেন্দ্রনাথ প্রতিভাসুন্দরীর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অপরদিকে

হেমেন্দ্রসহধর্ম্মিণী গৃহকর্ম্মবিষয়ে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাকে বিবাহের পর শ্বশুরকুলে সুগৃহিণী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ পূর্ব্বপ্রদেশে অবস্থিত জমিদারীর পর্য্যবেক্ষণে যাইয়া প্রায় তিনমাসকাল শারীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া অবিশ্রান্ত-ভাবে পরিশ্রম না করিলে বাতরোগাক্রান্ত হইয়া অল্প বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইতেন না। তাঁহার পরলোকগমনে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেও তাঁহাদের পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহারই বলে এবং তাঁহাদের পূজনীয়া মাতৃদেবীর উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যসাধনে সাধ্যমত নিরত রহিয়া শোকাশ্রুবারি-পরিপ্লুত নয়নে তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণসাধন করিতেছেন। হেমেন্দ্রনাথ জীবিত থাকিলে না জানি তাঁহাদিগকে উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিতেন এবং বঙ্গদেশের কতদূর মঙ্গল-সাধন করিতেন, তাহাই ভাবিয়া আমরা আজ তাঁহার জন্য তপ্ত অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছি। লোকে গুল্মাচ্ছাদিত সুগন্ধ কুসুমের সৌরভ উপভোগ করিলেও যেমন তাহার কারণকে সর্ব্বসময়ে খুঁজিয়া পান না, সেইরূপ হেমেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বিনয়াচ্ছাদিত থাকিয়া স্ত্রীশিক্ষার সৌরভবিস্তারের কারণ হইলেও অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া গেলেন। আজ সত্যের অনুরোধ ও ঈশ্বরের আদেশ রক্ষার জন্যই আমি এই সকল কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে প্রেরিত হইতেছি।

প্রতিভাসুন্দরীরও শিক্ষা তাঁহার মাতৃদেবীর শিক্ষার ন্যায় অপ্রয়োজনে প্রকাশ পাইত না। কিন্তু সময়ে এই প্রয়োজন পড়িয়াছিল এবং প্রতিভা-সুন্দরীর শিক্ষা সেই প্রয়োজনজনিত অভাব সকল পূর্ণ করিতে থাকাতে তাঁহার যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষারও মঙ্গল প্রভাব চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং সঙ্গীত করিয়া অপর পাঁচ জনকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মানবহৃদয় লালায়িত। পশুপক্ষীরাও যখন সঙ্গীত শুনাইতে ও শুনিতে ভালবাসে, তখন মানবাত্মাও যে তাহাতে সুখী হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে জনসাধারণের উপযুক্ত ধর্ম্মসঙ্গীত প্রচলিত ছিলনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন নিধুবাবুর দাম্পত্য প্রেমবিষয়ক টপ্পাই

সমধিক প্রচলিত ছিল ; রামপ্রসাদী সঙ্গীত সকল কৃষক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগেরই উপযুক্ত গান বলিয়া সকলের ধারণা ছিল এবং ধনীলোকদিগের গৃহে সময়ে সময়ে কালোয়াতী ওস্তাদ অথবা বাইজীগণ অর্থহীন বা দুর্বোধ্য হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ প্রভৃতি গাহিয়া পুরস্কার লাভ করিত। তখনকার কালে এইকারণে আর একটী গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতেছিল। সাধারণ লোকে ধনীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও অর্থাভাব বশতঃ ওস্তাদদিগকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া রাখিতে অথবা বাইজীদিগকে গৃহে আহ্বান করিতে অসমর্থ হইয়া অধিকাংশস্থলে বারাঙ্গনাগৃহে সঙ্গীত শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিত। এই অবস্থায় তদানীন্তন লোকদিগের সাধারণত এইরূপ সংস্কার হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে যে, অল্পবয়স্ক যুবকেরা গানবাজানা শিখিয়াছে বলিলেই তাহাদিগকে রীতিমত কুবিদ্যাবিশারদ ধরিয়া লইতে হইবে। এই সংস্কার যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এখনও অনেক পিতামাতাকে এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কার পোষণ করিতে দেখিয়াছি। আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কিছু পূর্ব্বাবধি নিতান্ত বয়াটে ছেলেরাই পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া জিমনাষ্টিক প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করিত ; সেই কারণে অধিকাংশ পিতামাতার আজ পর্য্যন্ত সংস্কার আছে যে প্রাতে ও বৈকালে পদচারণা ব্যতীত জিমনাষ্টিক প্রভৃতি ব্যায়াম করিলেই ছেলেরা বয়াটে হইয়া গেল। সুখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই সংস্কার অল্পে অল্পে অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। সেইরূপ কিছু পূর্ব্বে গানবাজানা সম্বন্ধেও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকাতে কন্যাদিগের কথা দূরে থাক্, পুত্রেরা পিতার সমক্ষে, পিতা পুত্রদিগের সমক্ষে, ভ্রাতাভগ্নী পরস্পরের সমক্ষে সঙ্গীত করিতে নিতান্তই সঙ্কুচিত হইতেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতেই এই ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতসকল ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা প্রভৃতি সকল প্রকার সুরেই বসান হওয়াতে যাহার যে প্রকার সুর ভাল লাগে, তাহার সেই প্রকার সুরেরই ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিবার সুবিধা হইল। এইরূপে পিতাপুত্রে, ভ্রাতায়ভ্রাতায়, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ পরস্পরের সমক্ষে অথবা মিলিতভাবে গান গাহিবার বাধা দূর হইল বটে ; কিন্তু স্ত্রীকন্যাভগ্নীদিগের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অনেকদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাক্, ব্রাহ্মদিগেরও সাহসে

কুলায় নাই এবং সুবিধাও হয় নাই। মেয়েদের সঙ্গীত প্রভৃতি হৃদয়ের উন্নতি-বিধায়ক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যে ভাল, এভাব ব্রাহ্মদিগেরও মধ্যে তখন ভালরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং তন্মধ্যে হেমেন্দ্রনাথই এবিষয়ে পথপ্রদর্শক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হেমেন্দ্রনাথের পত্নী ও কন্যার শিক্ষা অপ্রয়োজনে প্রকাশ পাইত না; প্রতিভাসুন্দরীর মাঘোৎসবে গান গাহিবার প্রয়োজন হওয়াতে তদ্বিষয়ে অনুমতি দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইল। তিনি পাঁচবৎসর বয়ঃক্রমে মাঘোৎসব উপলক্ষে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৯৪শকে) স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিতভাবে কয়েকটী গান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সর্ব্বসাধারণের এই জ্ঞান জন্মিল যে পুত্রদিগের ন্যায় কন্যাদিগকেও সুভাব সঙ্গীত সকল শিখাইলে পরিবারের মধ্যে সুধা বর্ষিত হয়, কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ আসে না; সন্তানগণকে বারাঙ্গনাগৃহে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার পরিণামফলে আত্মীয়স্বজনের হৃদয়ে তীব্র যন্ত্রণা প্রদান করিতে হয় না।

এই চারি পাঁচ বৎসর বয়সেই প্রতিভাসুন্দরী বিটনবিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। ইঁহার পূর্ব্বে হেমেন্দ্রনাথের এক ভগ্নী ও অপর কয়েকটী বালিকা কিছুদিনের জন্য এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেও প্রতিভাসুন্দরীরই দৃষ্টান্তে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাটীতে বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিবার পদ্ধতি স্থিরতররূপে প্রবর্ত্তিত হইল। ধনীনির্ধন, সম্ভ্রান্তঅসম্ভ্রান্ত সকলেরই কন্যাদিগের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা যে একটা আকাঙ্ক্ষার বিষয়, প্রতিভাসুন্দরী কি লেখাপড়া, কি সঙ্গীতাদি, সকল বিষয়েই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম হইয়া তাহা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে হিন্দুবালিকার মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম সুন্দররূপে পিয়ানো বাজাইতে পারিয়া আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট, বর্ত্তমান লর্ড ক্রোমারের কন্যা কুমারী বেয়ারিংয়ের নিকট হইতে একটী রূপার ফুলদানী বিশেষ পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পর হইতে দুয়েকটী করিয়া ব্রাহ্মকন্যা যথাসামর্থ্যে পিয়ানো বাজাইতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিয়ানো শিক্ষা যখন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন গান শিখিবার জন্য হারমোনিয়ম যন্ত্র যে সহজেই প্রচলিত হইবে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে সকল বঙ্গীয় পরিবারের কন্যাগণ

হার্মোনিয়মের সঙ্গতে সঙ্গীত করিয়া পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের পরিতৃপ্তি সাধন করেন, তাঁহাদিগের সকলেরই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। স্বদেশীয়দিগের মধ্যে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম আদিব্রাহ্মসমাজের জন্যই হার্মোনিয়ম যন্ত্র বিলাত হইতে আনয়ন করান। যাই হৌক, যথাসময়ে প্রতিভাসুন্দরী বিটনবিদ্যালয়ের প্রথমশ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রতিভাসুন্দরীর বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন (১৮৭৩খৃষ্টাব্দে) বিটনবিদ্যালয় অপেক্ষা আরও অধিক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য প্রধানত ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও সহায়তায় এবং ৺দুর্গামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে "হিন্দুমহিলা" নামে একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে এই বিদ্যালয় উঠিয়া যায় এবং দ্বারকানাথ বাবু প্রধান উদ্যোগী হইয়া "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" নামে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের অনুরূপ আর একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহারও স্থায়িত্বকাল তিনবৎসর। বিটনবিদ্যালয়েও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে একটী বোর্ডিং বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল অর্থাৎ বিদেশ হইতে আগত বালিকাদিগের উপযুক্ত বেতনে বিদ্যালয়েরই এক অংশে থাকিবার স্থান ও আহারাদি পাইবার বন্দোবস্ত হইল। পরবৎসর "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" বিটনবিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া "বিটনকলেজ"রূপে পরিণত হইল। *

বিটনবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই এবং "বিটন কলেজ" স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই হেমেন্দ্রনাথ প্রতিভাসুন্দরীকে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদিগের প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ "লোরেটো-হাউসে" প্রেরণ করিলেন। এইখানে তিনি ইংরাজী, ফরাশি, সঙ্গীত, পিয়ানো, চিত্র প্রভৃতি বিষয়ে আরও ভালরূপে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন এবং বাটীতে সেতার, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও পূর্ব্বকথিত নানা বিষয় শিক্ষা করিতেন। জর্মনি হইতে হার্পযন্ত্র আনাইয়া শিক্ষা দিবার জন্য হেমেন্দ্রনাথের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইতে পারে নাই। এই

* সঞ্জীবনী, ২০ আষাঢ়, ১৩০৫।

লোরেটো হাউসে প্রতিভাসুন্দরীর পূর্ব্বে একটীও বঙ্গীয় মহিলা প্রবেশ লাভ করেন নাই ; ইহার পরে দুএকটী করিয়া অনেকগুলি মহিলা তথায় শিক্ষালাভার্থ প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রতিভাদেবী সেখানেও কি লেখাপড়া, কি সঙ্গীতবিদ্যা, কি চিত্রবিদ্যা, সকলবিষয়েই ইংরাজ বালিকাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন হইলেন। তখন এই বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল না। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু প্রবেশিকাশ্রেণী খুলিবার পূর্ব্বেই প্রতিভাসুন্দরী উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষাকে এখানে যে ভাল বলিতেছি তাহা নহে। তবে বলিতে পারি যে, স্ত্রীবিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষাসমূহে এতদূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হইত না এবং হেমেন্দ্রনাথও তখন নানা কারণে তাঁহার কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হৌক্ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষাদান ব্যতীত হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার কন্যার শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে আর্য্যোচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদ অবধি তন্ত্র পর্য্যন্ত কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থেই স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠনরূপ কোনপ্রকার উচ্চশিক্ষার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় নাই, বরঞ্চ ঋষিরা পুত্রকন্যানির্ব্বিশেষে সমভাবে শিক্ষা দিবার বিধি দিয়াছেন এবং কার্য্যতও সেই বিধি মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং তন্ত্রকার মহাত্মাগণ অনেকটা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে পিতৃভাব ও মাতৃভাব ঈশ্বরের এপিঠ ও ওপিঠ ; পিতা ও মাতা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সংসারের এই কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া স্নেহবর্ষণে ইহাকে সিক্ত করিয়া রাখেন। এ অবস্থায় পিতা শিক্ষিত হইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য অর্জন করিবেন, আর মাতা অশিক্ষিতা থাকিয়া, অবলা হইয়া সংসারের সহিত সংগ্রামে প্রতিপদে পরাজয় স্বীকার করিবেন, ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ কথা। তবে, এইটুকু বলিতে পারি যে, স্ত্রীপুরুষেও যখন বিভিন্ন শরীর গঠন লাভ করিয়াছে, তখন তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা

সর্ব্বতোভাবে সমান ও অভিন্ন হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত সমদৃষ্টির সহিত করা যাইতে পারে। যদি বলা যায় যে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই গৃহকর্ম্ম শিখিতে হইবে, আশা করি, তাহা হইলে এরূপ কেহ বুঝিবেন না যে স্ত্রীলোককে জমিদারীর মকদ্দমার বিষয় ভাবিতেই হইবে এবং পুরুষকে কুটনা কোটা, বাটনা বাঁটা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। প্রত্যুত স্ত্রীলোকেরই গৃহাভ্যন্তরের কর্ম্ম এবং পুরুষেরই গৃহের বহিঃ-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। অবস্থাবিশেষে ইহার ব্যতিরেকস্থল দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর বিচার করিলে চলিবে না। সেইরূপ জ্ঞানা-র্জ্জন প্রভৃতি বিষয়েও বলা যায় যে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অনুমতি না দিয়া পিতামাতার দেখা কর্ত্তব্য যে পুত্রগণ যেন জ্ঞানার্জ্জন করিতে যাইয়া রুগ্নশীর্ণজীর্ণ শরীরে এক অকর্ম্মণ্য নিস্তেজ মন ধারণ করিয়া পুরুষত্ব হারাইয়া না ফেলে এবং কন্যাগণও যেন জ্ঞানার্জ্জন করিতে যাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রুগ্ন সুতরাং গর্ভাধানের অনুপযুক্ত শরীরে অহমিকাপূর্ণ নির্ম্মম কঠোর হৃদয় পোষণ করিয়া নিজেদের মাতৃত্ব বিনষ্ট করিয়া না ফেলে। হেমেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতিভাসুন্দরীর শিক্ষাব্যবস্থার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন—মস্তিকের উন্নতি, শরীরের উন্নতি, হৃদয়ের উন্নতি এবং আত্মার উন্নতি, সকল বিষয়ে তিনি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিভাসুন্দরী যাহাতে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়া, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া ঈশ্বরকে গভীররূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন এবং তাঁহার মাতৃত্ব যথাসময়ে বিকশিত হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তিনি পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষাদানবিষয়ে মাতার গুরুভার সম্যক্ বহন করিতে সক্ষম হন, হেমেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সেইরূপই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক কথায় প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন। হৃদয়ের উন্নতিই রমণীর মাতৃত্ব বিকাশের প্রধান সহায়, ইহা বুঝিয়া তিনি কন্যার হৃদয়ের প্রশ-স্ততার অন্যতর প্রধান উপাদান সঙ্গীত বিষয়েই সমধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা আজিও স্পষ্টই দেখিতেছি প্রতিভাসুন্দরী, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার পিতৃব্য মোহনসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দুইতিনজনে একত্র মার্কণ্ডেয় মুনির ন্যায় চিরবৃদ্ধ ও শুদ্ধচরিত্র সেই বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে বসিয়া

সঙ্গীত অভ্যাস করিতেছেন, পার্শ্বে উচ্চাসনে বসিয়া "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাবাহুঃ" এবং "অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ" সেই হেমেন্দ্রনাথ পরিদর্শন করিতেছেন, তাদের ভ্রমসংশোধন করিতেছেন—বাস্তবিকই সেই এক অপূর্ব্ব জীবন্ত চিত্র দেখিয়াছিলাম।

মাঘোৎসবে সঙ্গীত করা যেমন প্রতিভাসুন্দরীর অযাচিত খ্যাতি প্রতিপত্তির কারণ হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার অযাচিত খ্যাতিপ্রতিপত্তির আরও দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, একটী বিদ্বজ্জনসমাগম, দ্বিতীয়টী "বালক" পত্রে প্রথম স্বরলিপিপ্রকাশ। স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে গিয়া এই দুইটীর বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করি। অনেকেই জানেন যে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর ভবনে মধ্যে মধ্যে বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে উৎসব হইত। "বিদ্বজ্জন সমাগম" নামেতেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে—উদ্দেশ্য এই যে পাঁচজন বিদ্বান্ ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে না থাকিয়া এইরূপ সমাগমোৎসবে পরিচিত হইয়া পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী ও অনুষ্ঠাতা। এই "বিদ্বজ্জন সমাগম" নানা কারণে উঠিয়া যাইবার পর এপর্য্যন্ত তদ্রূপ আর কিছুই অনুষ্ঠিত হইলনা, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যাই হোক্, এই বিদ্বজ্জনসমাগমোৎসবে প্রধানত নানাপ্রকার যন্ত্রবাদ্য, গান, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রতিভাসুন্দরী বিদ্যালয়ে পিয়ানো বাদ্য ও ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীয় সঙ্গীত এবং গৃহে দেশীয় সঙ্গীত ও সেতার, এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্রবাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে প্রতিভাদেবী তাঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর সঙ্গীত করিয়া এবং সেতার প্রভৃতি বাজাইয়া সমগ্র সভাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সভায় কেবল মাত্র বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এবং আনুষঙ্গিকভাবে পরিচিত বন্ধুগণ ও আত্মীয়স্বজনগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সভাস্থ সকলেই সেই ১১।১২ বৎসরের সরস্বতীপ্রতিম বালিকার সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্য শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজও আমরা মানসপটে দেখিতেছি। প্রতিভাসুন্দরী ইহার জন্য ৺রঘুনন্দন ঠাকুরের নিকট একটী সুবৃহৎ মূল্যবান তানপূরা এবং রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট তাঁহার স্বপ্রণীত সঙ্গীত-

বিষয়ক অনেকগুলি সুন্দর পুস্তক পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হয়েন। ইহার কিছু পরে বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধনীতি গীতিনাট্য "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনীত হয়। ইহার বিষয়টা এই যে বাল্মীকি প্রথমে দস্যু ছিলেন, সরস্বতী বালিকাবেশে তাঁহার নিকট ধরা দিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে কবিতা লিখিবার সক্ষমতা বরপ্রদান করেন। মধ্যে বাল্মীকিকে লক্ষ্মী আসিয়া শত প্রলোভন দেখাইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এই অভিনয় সম্বন্ধে "আর্যদর্শনের" সম্পাদক লিখিতেছেন—"গত ১৬ই ফাল্গুন (১২৮৭) শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতানিবাসী মহর্ষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে "বিদ্বজ্জনসমাগম" উপলক্ষে বাল্মীকিপ্রতিভা" নামে একখানি অভিনব নাট্যগীতির অভিনয় হইয়াছিল। সেই অভিনয়ে উক্ত মহোদয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রতিভা" নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতীমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।" এতদুপলক্ষে কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় উক্ত পত্রে একটী সুন্দর কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। * এই অভিনয়কার্য্য দুএকটী নিতান্ত পরিচিত বন্ধু ব্যতীত কেবল উক্ত ঠাকুর পরিবার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। ভদ্র পরিবারের পুত্রকন্যাগণ যে নানাবিধ যন্ত্রবাদ্য এবং বিশুদ্ধভাবের অভিনয়াদি দ্বারা গৃহকে উজ্জ্বল ও সুখী করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই বিদ্বজ্জনসমাগমেই প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার পরে আজকাল দেখি, নব্যহিন্দু ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কন্যাগণ সেতার প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র শিখিতে অল্পে অল্পে আরম্ভ করিতেছেন। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এইরূপ সঙ্গীতাদি দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করা মাতৃত্ব-বিকাশের প্রতিকূল নহে, বরঞ্চ অনুকূল। মানুষের একটী স্বাভাবিক আমোদ-স্পৃহা আছে। মানুষ কখনই সর্ব্বদা পেচকবৎ গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে না। সেই স্পৃহা সুপথে চরিতার্থ হইবার উপায় না থাকিলে কুপথে চরিতার্থ হইবার উপায় অন্বেষণ করে। এইরূপ ভাবিয়াই হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার বালিকা কন্যাকে সাধারণের সমক্ষে সঙ্গীত ও অভিনয়াদি করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

* আর্য্যদর্শন বৈশাখ, ১২৮৮।

আর স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার সুফল দেখাইতে গেলেও কতকটা এরূপ প্রকাশ্যে না করিলেও চলে না। এবং এরূপ বিশুদ্ধ আমোদের দ্বারা অপর পাঁচজনের মনে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সৎবিষয়ে উৎসাহিত করা মাতৃত্বের অনুকূল বলিয়াই আমাদের ধারণা—ইহাতে যে প্রকার সংযম ও বুদ্ধির প্রয়োজন, সেই সংযম ও বুদ্ধি শ্রোতৃগণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদাতার উপরেও যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা মাতৃত্ববিকাশের পথে সহায়তা করে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বোধ হয় যে, যতদিন কন্যাদিগের একটা মধুময় বাল্যভাব থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে সঙ্গীতাদি বিশুদ্ধ আমোদজনক কার্য্যে তাহাদিগের সংযতভাবে যোগদান করা কোনরূপ দোষের বা অপবাদের কারণ হইতে পারে না। পরন্তু বিবাহের পরে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে পূর্ব্বোক্তভাবে অভিনয়গীতাদি করা মাতৃত্বের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অভিনয়গীতাদিতে যে চঞ্চলভাব আসে তাহা বাল্যভাবের অস্তিত্ব কালে পূর্ণ মাতৃত্ববিকাশের সহায় হইলেও বিবাহের পর অথবা বাল্যভাব চলিয়া গেলে আবার তাহাই মাতৃত্বের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। ফল অপক্ক অবস্থায় প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যেও দৃঢ়তা লাভ করে, কিন্তু পক্কতাপ্রাপ্তির মুখে, পরিপক্ক হইলেতো কথাই নাই, সামান্য বাতাসেও পতনোন্মুখ হইয়া থাকে। এই সঙ্গে আর একটী কথা বলা আবশ্যক—অর্থবিনিময়ে স্ত্রীলোকের অভিনয়াদি প্রদর্শন মাতৃত্ববিকাশের প্রতিকূল, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। প্রথমত ইহাতে শ্রীমান ভদ্রলোক অপেক্ষা ধনী বা দরিদ্র ইতর দর্শকেরই সমাগম অধিকতর সম্ভব এবং অভিনেত্রীবর্গের ধনলোভ অধিক হইলেই ক্রমে সেইসকল ইতরলোকদিগের মনোরঞ্জন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইবে; ক্রমে তাঁহাদের লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ চলিয়া গিয়া নিষ্কলঙ্ক সতীত্বের অথবা মাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, আনন্দবিতরণে মাতৃত্বপরিপোষক গম্ভীর আনন্দ এবং আমোদবিক্রয়ে মাতৃত্বপ্রতিকূল সভয় আশঙ্কার মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

প্রতিভাসুন্দরীর খ্যাতিপ্রতিপত্তির আর একটী কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "বালক" পত্রে স্বরলিপিপ্রকাশ। সূক্ষ্মদর্শী হেমেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে কেবল ব্যক্তিবিশেষ সঙ্গীত শিখিলে বা জনসাধারণকে দুএকদিন মাত্র শুনাই-

সেই চিরস্থায়ী ও সুদূরব্যাপী উপকারের সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে তিনি প্রতিভাদেবীর দ্বারা বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানীসঙ্গীত প্রভৃতি ইউরোপীয় স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছিলেন। এই কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর হেমেন্দ্রনাথের দেহান্তর সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার কিছু পরে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্রবধূ "বালক" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত স্বরলিপিপ্রণালীতে প্রতিভাসুন্দরী অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথম একটী সঙ্গীত প্রকাশ করেন। সেই সময়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাল সঙ্গীত শিখিবার একটী আকাঙ্ক্ষার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল এবং ঠিক উপযুক্ত সময়ে তিনি স্বরলিপিতে গান প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা স্বরলিপিকে সহজবোধ্য করিয়া বিস্তৃতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই, স্বরলিপিকে সাধারণগম্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই; প্রতিভাসুন্দরী স্বরলিপিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্যে সহজসাধ্যরূপে আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি স্বাধীনভাবে এই স্বরলিপি-প্রয়োগপথ আবিষ্কার করিতে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা বলিতে বাধ্য যে, এখন যতই কেন নূতন স্বরলিপি প্রকাশিত হউকনা, সকলেরই সহজপ্রয়োগপথের প্রথম পথ-প্রদর্শক হেমেন্দ্রনাথের কন্যা সেই প্রতিভাসুন্দরী। আজকাল স্বরলিপি দ্বারা সঙ্গীত প্রকাশের ফলে কত পুরমহিলা সঙ্গীতের দ্বারা হৃদয়ের উন্নতিসাধন করিতেছেন এবং কত যে ভবিষ্যতে করিবেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এতক্ষণে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে নব্যযুগের স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ প্রভূত সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। সহমরণনিবারণের প্রধান উদ্যোগী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের সূত্র ধরাইয়া দেন। বিধবাবিবাহের প্রধান উদ্যোগী ও তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক বিটনবিদ্যালয়েরও প্রথম সম্পাদক ছিলেন; ব্রাহ্মদিগেরই যত্নে বিটনবিদ্যালয় বিটনকলেজরূপে পরিণত হইল এবং যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যার শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার আর্য্যোচিত উচ্চাদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কি বিটনবিদ্যালয়, কি তাহারই অনুকরণে

স্থাপিত ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি বেসরকারী স্ত্রীবিদ্যালয়, কোনটীতেই প্রতিভাসুন্দরীর শিক্ষার আদর্শ সম্যকরূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। প্রতিভা-দেবী যখন বিদ্যালয়ে পড়িতেন, তখন বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না বলিলেই হয়, আর যেটুকু ছিল, তাহাও মেয়েদের আপনাদের মধ্যে; আমরা জানি যে তখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক বা না হউক, কেবল উৎসাহ-দিবার জন্য উপযুক্ততা অনুসারে ভালমন্দ পারিতোষিক সকলকেই দেওয়া হইত, কাহাকেও বাদ দেওয়া হইত না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিটন-বিদ্যালয়ের সম্মিলনের পর অবধি কি যে এক "পাশের" মোহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পুত্রদিগের সহিত কন্যাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোহ সকলের চক্ষে অন্ধকার ফেলিয়া দিয়াছে যে, শরীর যাক্, মন যাক্, সর্ব্বস্ব যাক্, তাহাতে কিছুই যেন আসে যায়না—কন্যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত হইলে নিজেরাও সুখী হয়েন এবং তাঁহাদের পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনেরাও তাঁহাদিগকে বিদুষী ভাবিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বালিকা কন্যাদিগকে যে চস্‌মা ধারণ করিতে হইতেছে, স্বাস্থ্যের আনুষঙ্গিক মুখের কোমলতা যে তাঁহাদিগকে হারাইতে হইতেছে, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদিগের অহমিকাবৃদ্ধি হইয়া যে মনেরও স্বাস্থ্যনাশ হইতেছে, এসকলের দিকে আত্মীয়-স্বজনের কোনই দৃষ্টি পড়ে না। এইপ্রকার ভাব কতকগুলি অত্যুদার নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিকতর পরিপুষ্ট হইতেছে। আমাদিগের মতে বিটন-বিদ্যালয়কে ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত কলেজরূপে পরিণত করাতে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার পথে গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত করা হইয়াছে। যদি ইহাকে স্বতন্ত্রভাবে মাত্র স্ত্রীলোকেরই একটী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত করা হইত, তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস যে, উক্ত বিদ্যালয়ে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইবার এবং নব্যসম্প্রদায়ের গার্হস্থ্য সুখশান্তি অব্যাহত থাকিবার, প্রত্যুত বর্দ্ধিত হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা থাকিত। বালকদিগের যথার্থ পুরুষত্ব অর্থাৎ তাহাদের পিতৃভাব অল্পে অল্পে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই যেমন পুরুষদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তৎসংযুক্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য, সেইরূপ বালিকাদের যথার্থ রমণীপ্রকৃতি অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাব অল্পে অল্পে বিকশিত করাই মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তৎসংযুক্ত প্রত্যেক

বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। কোন স্ত্রীবিদ্যালয়ে এই লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা হইতেছে বলিয়া জানি না। বোধ হয়, সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে একটীতেও মাতৃত্বের পরিপোষক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধায়ক শিক্ষাপ্রদান করা হয় না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে কিসে ক্লাসের ভালছাত্রী অন্যান্য মেয়েও পুরুষদিগের সহিত টেক্কা দিয়া তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সকলেরই এক বিকৃত লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কহাবত বা জয়পুরী প্রবচন।

রাজা ও বুড়ী।

প্রবচন। ৫৪ ডোকরী ঔর রাজা কোথ।

অনুবাদ। বুড়ী [অথচ] রাজার কথা।

অর্থ বুড়ীর রাজার কথা নিয়ে কি দরকার ? বুড় বয়সে রাজরাণী হবার আশা বৃথা।

রাজদাসী ও সর্দ্দারী।

প্রবচন। ৫৫ বাঁদী তো ছুঁ শাহকী, বাঁদী তো ছুঁ শাহকী, পর ঔরাকী সর্দ্দার।

অনুবাদ। রাজার বাঁদী [দাসী] তো আছি পরন্তু [কিন্তু] অন্যের সর্দ্দার।

অর্থ রাজার দাসী সত্য, কিন্তু অন্যের সর্দ্দার।

পুণ্য।

প্রবচন। ৫৬ রাজাকো দান ঔর প্রজা কো স্নান।

অনুবাদ। রাজার দান আর প্রজার স্নান।

অর্থ। রাজার দানে ও প্রজার স্নানে পুণ্য হয়।

রাজা ও পাশা।

প্রবচন। ৫৭ [১] রাজাকো স্থাব ঔর পাসা কো দাব।

[২] রাজা করে সো স্থাব,
ঔর পাসা পড়ে সো দাব।

অনুবাদ রাজার ন্যায় আর পাশার দান।
আর পাশার যাহা পড়ে তাহা দান।

অর্থ। রাজা যাহা করেন সবই ন্যায় অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত কিন্তু পাশায় [অক্ষক্রীড়ায়] যাহা পড়ে সবই দান অর্থাৎ যুক্তিশূন্য অন্যায়।

প্রাসাদ ও কুঁড়ে।

প্রবচন। ৫৮ কোঠৈ রাজকী রেবাড়ী, ঔর কোঠৈ নাইকা কো খরাকুটো।

অনুবাদ। কোথায় রাজার প্রাসাদ আর কোথায় নাপিতের কুঁড়ে ঘর।

অর্থ রাজার প্রাসাদ ও নাপিতের কুঁড়ে তুলনায় বহির্ভূত।

বঙ্গীয় প্রবচন। স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ।

উল্টা রীত।

প্রবচন। ৫৯ রাজা যোগী অগ্ন জল, ইনকা উল্টা রীত।
ডরতা রহেনা পরশরাম, থোড়া কর প্রীত॥

অনুবাদ। রাজা, যোগী, অগ্নি ও জলের উল্টো রীত।
হে পরশরাম! সর্ব্বদা [এই গুলিকে] ভয় কোরো [ও] অল্প প্রীত রেখো।

অর্থ। এক রাজার দুই মন্ত্রী ছিল। রাজা ক্রোধ পূর্ব্বক একটীর

প্রাণবধ করেন। পরশরাম নামধারী অপর মন্ত্রীকে তদীয় এক বন্ধু এই উপদেশ দিয়াছিলেন "পরশুরায়! রাজা, যোগী, অগ্নি ও জলকে ভয় কোরো ও অল্প সম্পর্ক রেখো।" রাজা অল্প-ক্রোধে বধদণ্ড প্রয়োগ করেন। যোগী শাপ দেন। জল ও অগ্নি দ্বারা মৃত্যুও হইতে পারে। অতএব এই গুলির সহিত সাবধানে ব্যবহার করিও "থোড়া কর প্রীত"।

ইংরাজী প্রবচন। Put no faith in a prince's word.

সংস্কৃত প্রবচন। বিশ্বাসোনৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ।

বঙ্গীয় প্রবচন। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥

বঙ্গীয় প্রবচন। আগুন্ নিয়ে খেলা বাবা টেরটী পাবা।

ঈশ্বরনাম ও যোগ্যকাল।

প্রবচন। ৬০ সুঝে উরন তালে
উর নয়া চাঁদনে "রাম, রাম"।

অনুবাদ। দেখতে ভাল পায়না, আর নব চন্দ্রোদয়ে "রাম, রাম" (ঈশ্বর) করে।

অর্থ ভালতো দেখতে পায়না, অথচ প্রতিপদে (প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার) চাঁদকে প্রণাম করে।

ঈশ্বরনাম ও আর্ত্তনাদ।

প্রবচন। ৬১ কঠে রাম রাম;
কঠে ঠায় ঠায়।

অনুবাদ। কেহ করে "রাম রাম" (ঈশ্বর),
কেহ করে "হায়! হায়!"।

অর্থ। সুখী লোকেরা "ঈশ্বর, ঈশ্বর" (পরমেশ্বরের নাম করে আর দুঃখীলোকেরা "হায়! হায়!" (দুঃখ) করে।

বঙ্গীয় প্রবচন। কারুর পৌষমাস, কারুর সর্ব্বনাশ।

*

রাজভবন ও ভাঁড় (=ছোলাভাজার দোকান)

প্রবচন। ৬২ সোবে ভাঁড় মেঁ
উর সপনো আবে মহলাকো।

অনুবাদ। সোবে ছোলাভাজার দোকানে আর স্বপ্ন দেখ্‌বে রাজ প্রাসাদের।

অর্থ। মুড়ী মুড়কীর দোকানে শুয়ে রাজপ্রাসাদের (=রাজা হবার) স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র।

বঙ্গীয় প্রবচন। কাঁথায় শুয়ে লাক টাকার স্বপ্ন দেখা।

রাজা ও তুলা ব্যবসায়ী।

প্রবচন। ৬৩ কমর কঁড়েরাকো, মন রাজা কো।

অনুবাদ। কাজ তুলার (ব্যবসায়), মন রাজার।

অর্থ কাজ যদিও তুলার ব্যবসা কিন্তু বাসনা রাজার মতন (রাজো-চিৎ) উঁচু।

এই প্রবচন সম্বন্ধে একটী গল্প শোনা যায়। এক রাজা ছিলেন। তিনি রাণীকে বলিলেন—"ছেলে যদি সুন্দর না হয় তো, তুমি ও তোমার সন্তানের শিরশ্ছেদ হইবে।

রাণী একটী কাল সন্তান প্রসব করিলেন। প্রাণ নাশের আশঙ্কায় তিনি দাইয়ের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সদ্যোজাত জনৈক তুলাব্যবসায়ীর পুত্রের সহিত ছেলে বদল করিলেন। এই ছেলেটী অত্যন্ত সুন্দর ও রূপবান ছিল। রাজা সুন্দর ছেলে হইয়াছে শুনিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগি-লেন ও রাণীকে পাটরাণী স্থানীয় করিলেন।

এই রূপে কিছু বৎসর অতিবাহিত হইলে পুত্রদ্বয় বড় হইল। রাজার পালিত পুত্র প্রত্যহ তাকিয়া ছিঁড়িয়া তুলা বাহির করিয়া খেলা করে। তুলাব্যবসায়ীর পালিত পুত্র স্বয়ং রাজা সাজে ও সঙ্গীদিগকে সেবক বানাইয়া খেলা করে।

একদিন একটী বৃদ্ধা রমণী একটী "জহর" বা দামী প্রস্তর লইয়া একজন স্বর্ণকারের নিকট যাচাইতে গিয়াছিল। সে প্রস্তরটী লইয়া আর প্রত্য-র্পণ করিলনা। বৃদ্ধা রাজার নিকট আবেদন করিল। বিচারে স্বর্ণকার

মুক্তি পাইল। বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্বোক্ত তুলাব্যবসায়ীর গৃহের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সেকালে তাহার পুত্র রাজা হইয়া সঙ্গীদিগের সহিত খেলিতেছিল। সে রমণীকে ডাকিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধা আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। তুলাব্যবসায়ীর পুত্র সঙ্গীদিগকে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণকারের স্ত্রীর নিকট গিয়া এই বলিতে আদেশ করিল—"আমাদের রাজা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, স্বর্ণকার বৃদ্ধার নিকট হইতে যে মহার্ঘ প্রস্তর লইয়াছে প্রত্যর্পণ কর। নতুবা তোমাদিগের সপরিবারে শিরশ্ছেদন হইবে।" এই কথা শুনিয়া স্বর্ণকারের স্ত্রী স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ "জহর" আনিয়া দিল। হীরা লইয়া গিয়া তাহাদিগের রাজার হস্তে প্রদান করিল। "রাজা" তৎক্ষণাৎ উহা বৃদ্ধাকে অর্পণ করিল। বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। অতঃপর বালক-রাজা তাঁহার সঙ্গীদ্বারা স্বর্ণকারকে সজোরে ধরিয়া আনিয়া গাধার চড়াইয়া সহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিল। তদীয় সঙ্গীরা "চৌর্য্য কর্ম্মের এইরূপ পরিণাম" এই চীৎকার করিতে করিতে স্বর্ণকারকে লইয়া সহর মধ্যদিয়া যাইতে লাগিল। রাজাও তৎকালে ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণকারের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে লইয়া রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন রাজা সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন তখন তিনি মহাসন্তুষ্ট হইয়া তুলাব্যবসায়ীর পুত্র ও তদীয় সঙ্গীদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার করিলেন। পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাণীর নিকট তুলাব্যবসায়ীর পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিজের পুত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।—রাণী বলিলেন—"সে তাকিয়া হইতে তুলা খুলিয়া খেলা করে"। রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—"এ ছেলেকে তুলাব্যবসায়ীকে দিয়া তাহার পুত্রকে গ্রহণ করা যাউক"। এই কথা শুনিয়া রাণী আশ্বস্ত হইয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তুলাব্যবসায়ীকে সপারিতোষিক তাহার পুত্র ফিরিয়া দিলেন ও স্বীয় পুত্রকে মহাসমারোহে পুনরায় গ্রহণ করিলেন।"

আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।

দিল্লী ও ভাঁড়।

প্রবচন। ৬৪ দিল্লী মেঁ জার ভী ভাঁড় ঝোঁকা কো ?

অনুবাদ। দিল্লীতে গিয়েও কি ছোলা ভাজার ব্যবসায় কোরলে ?

অর্থ দিল্লীতে গিয়েও কি ভেরেন্দা ভাজলে অর্থাৎ বৃথা সময় নষ্ট কোরলে ? দিল্লীতে গিয়ে সকলেই বড় লোক হোয়ে আসে। তুমি কিছুই কোরতে পারলে না।

বঙ্গীয় প্রবচন। ভেরেণ্ডা ভাজা।

বিদ্যা ও প্রহার।

প্রবচন। ৬৫ জোশী কী চোট,
বিদ্যাকী পোট।

অনুবাদ। পণ্ডিতের মার, বিদ্যার ভার।

অর্থ। শিক্ষকের প্রহার বিদ্যার কারণ।

ইংরাজী প্রবচন। Spare the rod, spoil the child.

মৃত্যু ও প্রলয়।

প্রবচন। ৬৬ আপ মরর্ষ্যা জগ পরলায়।

অনুবাদ। আপনি মোলেই জগতের প্রলয়।

অর্থ। নিজের মৃত্যু জগতের প্রলয় স্বরূপ।

মৃত্যু ও শ্বাস।

প্রবচন। ৬৭ সাহসী আবে তো মরে হী কাঁ।

অনুবাদ। শ্বাস আসে তো মরিবে কেন ?

অর্থ। নিশ্বাস প্রশ্বাস থাকলে মৃত্যুর আশঙ্কা কেন ?

জুতা ও জামাতা।

প্রবচন। ৬৮ জুতাঁ মারা জামাই বন্ গয়া।

অনুবাদ। জুতা মেরে জামাই হইল।

অর্থ। জোর করে জামাই হইল।

টিপ্পনী। এরূপ প্রবচন নাগরা জুতার দেশেই শোভা পায়।

জুতা ও নিমন্ত্রণ।

প্রবচন। ৬৯ খে জোতো ন্যোতো কে পান, খে জোতো জুতা কে পান।

অনুবাদ। নিমন্ত্রণ কর তো ভাল, তা না হ'লে জুত মেরে নিমন্ত্রণ করবো।

অর্থ। জোর করে নিমন্ত্রণ করাবো।

টিপ্পনী। এ প্রবচনটীতেও পূর্ব্বোক্ত প্রবচনের ন্যায় গায়ের জোর প্রকাশ পাইতেছে।

কাজ গোছান।

প্রবচন। ৭০ আই ছী মিলবা বৈঠা পীনী দলবা।

অনুবাদ। সাক্ষাৎ করিতে এলাম, বসিয়ে নিলে কাজ করাতে।

অর্থ। এক কাজের জন্যে এলাম, অন্য কাজ করাতে বসালে।

ক্ষুধার জোর।

প্রবচন। ৭১ ভুক মেঁ কিবাড় পাঁপড়।

অনুবাদ। ক্ষুধায় কপাট ও পাঁপড়।

অর্থ। ক্ষুধার সময় কপাটও পাঁপড় ভ্রম হয়।

মূর্খতা।

প্রবচন। ৭২ গমার কে ভাবে কবাড় হী পাপড়।

অনুবাদ। গাঁয়ের লোকের কাছে কপাটই পাঁপড়।

অর্থ। মূর্খ লোকের নিকট কপাট পাঁপড় জ্ঞান।

দেবতা ও পূজারী।

প্রবচন। ৭৩ (১) দেব জৈসা পূজারা।

(২) জৈসে দেব উসে পূজারী।

অর্থ। যেমন দেবতা তদনুরূপ পূজারী।

বঙ্গীয় প্রবচন। (১) যেমন দেবতা তেমনি রূপ।
শাকাটির নৈবিদ্য, পাকাটির ধূপ॥
(২) যেমন দেবতা তেমনি নৈবিদ্য।

শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী।

পাপ হইতে মুক্তি।

——oo ✻✻✻ oo——

সমুদয় আকাশ পরমেশ্বরের দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানস্বরূপ; তিনি আকাশের মধ্যে থাকিয়া সকল জানিতেছেন; তিনি মঙ্গল স্বরূপ, তিনি সকল মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তিনি এই জ্যোতির অন্তরে থাকিয়া চক্ষুতে আলোক বিধান করিতেছেন। তিনি জলের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে রসের দ্বারা সুখ বিধান করিতেছেন। সেই পরমেশ্বর আমাদের পশ্চাতে, দক্ষিণে, সম্মুখে, উত্তরে; তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি পূর্ণ পুরুষ। আর সকলি তাঁর আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেছে; তাঁরি লক্ষ্য সম্পাদন করিবার জন্য জগৎ সংসার ব্যস্ত রহিয়াছে। আমরা যেমন ক্ষুদ্র জীব হইয়া আমাদের শরীরকে যথা ইচ্ছা নিয়োগ করি; পরমেশ্বর মহানাত্মা, তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে ঘূর্ণায়মান করিতেছেন। তাঁরি আদেশে থাকিয়া সকল বস্তু স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। মনুষ্য তাঁর সাধারণ কার্য্যে যোগ দিতেছে। মনুষ্য স্বাধীন এই জন্য ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্যে যোগ দিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিপরীত আচরণ করিয়া দণ্ডভোগ করিতেছে। রোগের দ্বারা শরীর ক্ষয় হইয়া গেলে

তত ক্ষতি নাই, যত পাপ দ্বারা আত্মা ক্ষয় হইয়া গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আমরা রোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসকের নিকট বলিতে পারি এবং সেও রোগ শান্তি করিতে পারে কিন্তু আত্মাতে পাপ আসিয়া আক্রমণ করিলে পাপের প্রপীড়ন কাহাকেও বলিতে পারি না। আত্মাতে পাপ আসিয়া অভিভূত করিলে তখন তাহাকে কে ঔষধ দিতে পারে? আত্মা পাপে অভিভূত হইয়া মনে মনে আপনাপনি দগ্ধ হয়। রোগের সময় রোগীর সহিত সকলে সমদুঃখী হয়, বন্ধু বান্ধব সর্ব্বদাই নিকটে থাকে; কিন্তু যখন পাপেতে আক্রান্ত হইয়া ম্রিয়মান হয়, তখন বন্ধু বান্ধব ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে; অতএব রোগ হইতে পাপ ভয়ানক পীড়ন। পাপ কিনা ঈশ্বরের আদেশের বিপরীত করা। ঈশ্বর বলিতেছেন কাহারো ধন অপহরণ করিও না, এই আদেশের বিপরীত অপহরণ করিলে গ্লানি উপস্থিত হইবে, চোর বলিয়া লজ্জিত হইবে, লজ্জা না পাইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, কেহই তাহার সহিত সহবাস করিবে না, বন্ধুরা চোর বলিয়া পরিত্যাগ করিবে, তোমার সঙ্গী বলিয়া অন্যের নিকট বলিতে লজ্জিত হইবে। ঈশ্বরের নিয়ম পরধন হরণ করিও না; দেখ ঈশ্বরের একটী আদেশ লঙ্ঘন করিলে কত যন্ত্রণা। ঈশ্বর যে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেছেন তাহা কদাপি করিবে না। তিনি যে প্রকার যখন যে আদেশ করিবেন তাহা পালন করিবে। যদি দুঃখীর দুঃখ মোচন কর, যদি লোকের উপকারের জন্য চিকিৎসালয় ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা ও পালন কর, কেমন আত্মপ্রসাদ হয়, লোকে কীর্ত্তি ঘোষণা করে, সকলে আশীর্ব্বাদ করে; দেখ একটী সৎকর্ম্মের দ্বারা সকলের প্রিয় হই। জল পিপাসুকে এক ঘটি জল দান করিলে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা শান্তি করিলে, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন দিলে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য হয়, লোকেরা প্রীতি করে, স্বর্গলোক মুক্তদ্বার হয়। ঈশ্বরের একটী আজ্ঞা পালন করিলে দেখ কত আনন্দ, অতএব ঈশ্বরের ধর্ম্ম পালনের জন্য অহরহ যত্ন কর। লোকের ভয় কোন কার্য্যেরই নহে, ঈশ্বরকে ভয় করিলে সকল ভয় চলিয়া যায়।

ঈশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র রহিয়াছে তাঁহার নিকট কোন কর্ম্ম গোপন থাকে না। ঘোর অন্ধকার নিশায়ও কোন কুকর্ম্ম করিলে তিনি জানিতে পারেন। সকলের অজ্ঞাতসারে একটী সাধুকর্ম্ম করিলে একটী সৎ ইচ্ছা হইলে, তাহা আর কেহই

জানে না, কিন্তু ঈশ্বর অবগত হইয়া তাহার পুরস্কার বিধান করেন ; সেইরূপ কোন দোষের কর্ম্ম করিলে গ্লানি উপস্থিত হয়, ঈশ্বর তাহা জানেন এবং তদনুসারে প্রতীকার করিবার জন্য দণ্ডবিধান করেন। তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, অতএব শুভ কর্ম্মে উৎসাহী হও, পাপ কর্ম্ম করিতে ভয় কর।

ইহ সংসারেও দেখ পাপে স্ফীত হইতে পারে না। পাপ দ্বারা সকলের নিন্দাভাজন হয়, লজ্জাতে কাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করা যায় না, সকল লোকে তিরস্কার করে। পদে পদে লজ্জা ভয় দুঃখ চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করে। কিন্তু যদি পাপের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হও, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, যদি পাপ হইতে নিবৃত্ত না হও ; উল্টা পাপে পড়িয়া দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ভোগ করিয়া পাপের উপর পাপ সঞ্চয় কর, তাহা হইলে ইহ-লোক হইতে পরলোকে যন্ত্রণা অধিক হইবে। অতএব ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, যদি কোন দোষ করিয়া থাক অনুতাপ কর, অশ্রু পূর্ণ নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁহার নিকট দোষ গোপনের সম্ভাবনা নাই। কত ব্যক্তি পাপের ভয়ে গঙ্গাস্নান করে, তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করে তাহাতে পাপ যায় না ; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিয়া ক্রন্দন করে সে ব্যক্তি অশ্রুজলে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ক্রন্দন করিয়া চক্ষু হইতে যে জল পড়ে সেই জলে পাপ ধৌত হয়।

ধর্ম্ম আমাদের পরম উপকারী। এখানে আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে কেহই পারে না এক পরমেশ্বর পারেন ; সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতে ধর্ম্ম উপদেশ দেন। ভূতকালে যে সকল পাপ সঞ্চয় করিয়াছি তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট শিরোনত করিলে তিনি মস্তককে উন্নত করেন। একবার পাপভরে মস্তককে ঈশ্বরের পদে নত করিয়া মস্তককে উন্নত করিতে পারিলে পাপভার চলিয়া যায় এবং ভবিষ্যতের পাপকে পরাজয় করিবার বল পায়, ভূতকালের রাশি রাশি সঞ্চিত পাপ ভস্মীভূত হয়, ঈশ্বরের অমৃত বারিতে আত্মা সুপ্রসন্ন হয়, পাপের প্রতি অধিক ঘৃণা হয়, ইহাতে আত্মা অধিক উন্নত হয়। ধর্ম্মের সাহায্যে যদি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই তবে তাঁর শরণাপন্ন হইয়া সকল ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাই। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি যে ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছ তার উপযুক্ত পাত্র কর। নির্জ্জনে সজনে যেন

তোমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকল কর্ম্ম করি, তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার ধর্ম্ম পালন করি। যেন তোমার সহবাসেই আনন্দ বৃদ্ধি হয়। আমরা যে সমুদয় পাপ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর এবং পরলোকের পথ পরিষ্কৃত কর।

শ্রী:—

প্রণয় প্রশ্ন।

এ কি তবে সবি সত্য
হে আমার চিরভক্ত ?
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য ?
আমার মধুর অধর, বধূর
নব লাজ সম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

চির-মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি ?
চরণে আমার বীণা-ঝঙ্কার বাজে কি ?
এ কি সত্য ?
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া ?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া
এ কি সত্য ?
তপ্ত কপোল পরশে অধীর

সমীর মদির মত্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণ-বাঁধন মোর দুই ভুজে বাঁধা রে
এ কি সত্য ?
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চল খানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে
এ কি সত্য ?
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চির জনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বার্ণিয়ারের বিজ্ঞাপনী।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের সঞ্চয় তাঁহার কূট রাজনীতির মূল মন্ত্র ছিল। ধর্ম্মের ভান করিয়া পরিশেষে সেই সত্যধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে এই ধর্ম্মদ্বেষী সম্রাট অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার শাসন সময়ে রাজ্যে অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং তাহাই সেই বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়াছিল। ফলতঃ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঐতিহাসিকগণ যাহাই নির্দ্ধারণ করুন না কেন, ধর্ম্মদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মহীনতা এবং অত্যাচারপ্রপীড়িত আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন ও ঐকান্তিক অভিসম্পাতই যে এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি শনৈঃ শনৈঃ শিথিল করিয়া দিয়াছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

যে সময়ে এইরূপ অত্যাচারের খরস্রোতে নিরীহ ভারতবাসীদিগের মনে অত্যাচারী সম্রাটের প্রতি ঐকান্তিক অভিশাপ অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছিল, তৎকালে বার্ণিয়ার ও সিগনর মেন্নুসী নামে দুইজন বৈদেশিক চিকিৎসক দিল্লীর সিংহাসন পার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন। বার্ণিয়ারের মন্তব্যই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সিগনরমেন্নুসী সম্বন্ধে আপাততঃ আমরা কিছুই উল্লেখ করিতেছি না।

চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ এই ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার দ্বাদশ বর্ষ কাল ভারতবর্ষের যথা তথা ভ্রমণ করিয়া ও অষ্টবর্ষ কাল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পারিবারিক চিকিৎসক ও পার্শ্বচর থাকিয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের দৈন্য দুর্দ্দশা ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাহার তুলনায় মনে হয় আজ বৃটীশ শাসনে ভারতে স্বর্ণযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সপ্তদশ শতাব্দীর পাশবিক অত্যাচারের তুলনায়

বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর "কর্ণ বিমর্দ্দন" হইতে "পিলাকটা" পর্য্যন্ত অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তৎসমসাময়িক অবস্থা জ্ঞাপন করাইতে যাইয়া বার্ণিয়ার ফরাসী রাজমন্ত্রী কালবার্ট সমীপে যাহা লিখিয়াছিলেন আমরা তাহারই আভাস প্রদান করিতেছি। তিনি ভূমি ও রাজস্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত সমস্ত ভূমিই সম্রাটের খাস ভূমি। এই সকল ভূমি বিলির বন্দোবস্ত আছে। সাধারণতঃ দুই রকমেই তাহা বিলি হইয়া থাকে। প্রথম 'জায়গীর'—দ্বিতীয় 'খালিসা'। রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতনের ও সৈন্য সামন্তের ভরণ পোষণের জন্য যে জমি দেওয়া হয় তাহাই জায়গীর। জায়গীর জমি নিষ্কর। খালাসীজমি উচিৎ জমায় পত্তন করা হয়। সেই জমা বা করই রাজ্যের প্রধান রাজস্ব। ইহা দ্বারাই রাজ্যের আয় দেখা দিয়া থাকে।

জমিপত্তন সম্বন্ধে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—ঐ সমস্ত খালিসা জমি বাৎসরিক জমায় ইজারা পত্তন করা হয়। ইজারাদারগণ দস্তুর মত ডাক নজরে তাহা গ্রহণ করে। জায়গীরদারগণ "জায়গীর" জমিরও ইচ্ছামত রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ ইজারা পত্তন করেন কেহ প্রজাবিলি করিয়াই সুখী থাকেন। জায়গীরদার এবং ইজারাদারগণই ঐ ঐ ভূমির এবং ভূমিস্থ প্রজাগণের সর্ব্বময় হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, তাঁহাদের অব্যাহত প্রতাপ সর্ব্ব বিষয়ে অক্ষুণ্ণ থাকে।

ঐ সমস্ত ভূমি বিলি সম্বন্ধে প্রজাদের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও পরিণামে প্রজা সাধারণ যে কি পরিমাণে অত্যাচারগ্রস্ত ও প্রপীড়িত হয় তাহা দেখাইতে গিয়া বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—"রাজ সরকার হইতে ভূমির ইজারা বিলি বন্দোবস্তে প্রজাসাধারণের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও এই মন্দভাগাদের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত। রাজদরবারে ভূমির "ডাক নজরের" কোন একটা নির্দ্দিষ্ট হার নাই। অতি উচ্চ মূল্যে ইজারাদারগণ জমি রাখিয়া থাকে, তারপর সরকারের "খাস্‌নজর" দরবারের বহুবাশী কর্ম্মচারীদের উদর পূরণ ও মনরক্ষা ইত্যাদিও আছে। এই অজস্র ব্যয়ের জন্য তাহারা অনুমাত্রও চিন্তা করে না। এই সকল খরচ অতি উচ্চ হারে সুদ সহ ঐ ঐ ভূমিস্থ প্রজা হইতে উশুল করিয়া লওয়া হয়। সে অত্যাচার কাহিনী কর্ণপাত করিতেও লোক



ঔরঙ্গজেব।

দেশ মধ্যে নাই। "বার্ণিয়ার তাহার স্বদেশের তুলনায় এতদ্দেশের বিচার আচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন"—আমাদের ফরাসীদেশের ন্যায় অত্যাচারীর অত্যাচার দমনপরায়ণ ন্যায়বিচারক মোগল সাম্রাজ্যে অতি দুর্ল্লভ, উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের ও একান্ত অসম্ভব। অত্যাচার প্রপীড়িত আর্ত্তের করুণ ক্রন্দনে কাহারও হৃদয় বিচলিত হয় না। কাজেই মোগল সাম্রাজ্যে প্রজাগণ অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারে উৎপীড়িত—অতি অল্প কারণেও পৈশাচিক তাণ্ডবের পরিসীমা থাকেনা। অবশ্য প্রদেশে প্রদেশেই "কাজী" উপাধিধারী বিচারকগণ বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজ করিতেছেন কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের দুঃখ দুর্দ্দশা বিমোচন ক্ষমতা তাহাদের হস্তে তত বিমুক্ত ভাবে রক্ষিত হয় নাই। দিল্লী আগ্রার নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং প্রাদেশিক বিচারাসনের সন্নিকটে অত্যাচার তত খরস্রোতে প্রবাহিত হইতে অবকাশ পায় না বটে; কিন্তু সে সকল স্থানও সম্পূর্ণ শান্তিপ্রদ ও নিরাপদ বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় না।"

বার্ণিয়ার সাহেব জায়গীরদার এবং ইজারাদারদিগকেই অধিক অত্যাচারী সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"যদি কোন ইজারাদার বা জাইগীরদার কোন গৃহস্থের ব্যয় অপেক্ষা আয়ভাগ বেশী বলিয়া অনুমান করিতে পারেন অমনি তাহার লোলুপদৃষ্টি ঐ হতভাগ্যের প্রতি নিপতিত হয়। ছলে হউক, বলে হউক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার গোলাগার লুট পড়িয়া যায়। হতভাগা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া নীরবে বসিয়া থাকে। বিচারালয়ে যাইতেও সাহসী হয় না।

কোন গৃহস্থ যদি গোপনে কিছু হস্তগত করিতে পারে অত্যাচারীর খরদৃষ্টি হইতে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত করিয়া অতি দীনহীনের ন্যায় কালযাপন করে। বাহ্যিক আকারে ধনী দরিদ্র পরিচয় করা যায় না। এইরূপে উৎপীড়ন ও অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপনীত হইতে চলিয়াছিল। অনেক স্থলে অপেক্ষাকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে অল্পলোকেই সাহসী হইত। ভয়, পাছে অত্যাচারীর খরদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতে হয়।

ঐ সমস্ত অত্যাচারকাহিনী বাদসাহের কর্ণগোচরও হইতে পারে না। কাজেই তাহার নিকট এ সকল বিষয়ের প্রতিকার প্রত্যাশা একরূপ অসম্ভব।

যদি কখন কোন গৃহস্থ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাদশাহের ন নামটী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করে, অমনি তাহাদের ভিটা উচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগে ক স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। অনেকে তা হাতে বাধ্য হয়। অনেক হতভাগ্যকে সে অত্যাচারের তাণ্ডবে একেবারে ইহ লোক হইতেও অপসৃত হইতে হয়। অনেকে আবার জন্মভূমির মায়া পরি ত্যাগ করিতে না পারিয়া অশেষ নিগ্রহ সহ্য করিয়া বাস করিয়া থাকে।

এই সকল প্রজা সাধারণের ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "জাত- দারগণ ও ইজারাদারগণ যে ভূমি রায়তের নিকট পত্তন করে তাহার কোন পাকাপাকি বন্দোবস্ত নাই। পত্তনীদার ইচ্ছা করিলেই প্রজাকে ভূমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন এবং সদা সর্ব্বদা এরূপই করিতেছেন। এক জমি হইতে এক ফসল কোন প্রজা নিশ্চিন্তে ভোগ করিতে পারে ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভূমির এরূপ অস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার প্রচলিত থাকায় সাধারনতঃ বল প্রয়োগ ব্যতীত কাহারও দ্বারা ভূমি চাষ আবাদ করান দুরূহ। জল চলাচলের নালা খাল পর্য্যন্তও কেহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয় না। অত্যাচারে প্রজা সাধরেণের গৃহকার্য্যে উন্নতি ও সংসার ধর্ম্মে শ্রীবৃদ্ধির প্রতি একেবারেই দৃষ্টির অভাব। এমন কি অত্যাচারী কর্ত্তৃক একবার গৃহাদি বিনষ্ট হইলে আর তাহারা গৃহাদি প্রস্তুত করিতেও ভয় পায় এবং বিরত থাকে। চাষ বাসে প্রজা সধারণের এরূপ ঔদাসিন্য লক্ষিত হইলেও জমির মালীক (জায়গীরদার বা ইজারাদারগণ) তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করেন না, প্রজার ত্রুটী ধরিয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেন্। প্রজা স্ত্রী পুত্র লইয়া অনশনে মারা যাউক তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনকারীদিগের অবস্থাও তদনুরূপ। তাহাদিগেরও স্বস্তি নাই। শিল্পকর, বণিক প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়া বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন।

"শিল্পীদিগকেও কৃষিজীবীদিগের ন্যায় অত্যাচারী হইয়াই বাস করিতে হয়। তাহাদিগকে সময় সময় বেগার খাটিতে বাধ্য হইতে হয়। সময়মত লাঠিও ধরিতে হয়। তবে তাহাদের মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটে এবং ইহাতেই তাহারা নিজেকে নিজে প্রচুর সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে।

বণিকদিগেরও ঐ দশা, বণিকগণ দৈবাৎ যদি কখনও কোন কারবারে অতিরিক্ত লাভে লাভবান হয় তখনি অত্যাচারীর আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।

রাজ্যের এই অবস্থার জন্য রাজা সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু ঔরঙ্গজেব এ সম্বন্ধে দায়িত্ব জ্ঞান হইতে একেবারেই বর্জ্জিত ছিলেন। তিনি চাটুকারের বাক্যে এবং দুষ্টবুদ্ধির দুষ্ট মন্ত্রণায় এতই বিমোহিত হইতেন যে রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গলের দিকে তাঁহার একটুও লক্ষ্য থাকিত না। এই সকল চাটুকার ও দুষ্টবুদ্ধিরই তিনি বিশেষ সমাদর করিতেন। এই সকল উপলক্ষ করিয়া বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন। "মোগল দরবারে রাজভক্ত কর্ম্মচারীর একান্ত অসদ্ভাব। উচ্চ আভিজাত্যবংশের প্রাচীন খ্যাতনামা পরিবারের কিম্বা শ্রেষ্ঠ ও ধনশালী পরিবারের লোক দিল্লীর দরবারে নাই। তৎপরিবর্ত্তে এই সুবিস্তৃত ভারত সম্রাজ্যের অধীশ্বর কতকগুলি অধস্তন সমাজের নীচাশয় পশুচরিত্র অজ্ঞ স্তাবকমণ্ডলীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন।"

ঔরঙ্গজেবের সময়ে একরূপ উৎকট শাসনে রাজ্যের আয় আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ঔরঙ্গজেব ইহাতেই নিজেকে নিজে বিশেষ কার্য্যকুশল সম্রাট বলিয়া মনে করিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহার স্তাবকমণ্ডলীরাও অত্যধিক মাত্রায় তাঁহাকে তাহা বিশ্বাস করাইতে ত্রুটী করিত না। এমন অবস্থায় সম্রাট যে, ঐ সকল নীচ লোকের হস্তেই রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিরাপদ ছিলেন ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজেই তাহাতে অত্যাচার যে অতর্কিতভাবে প্রবাহিত হইবে ইহাতেও কি সন্দেহ আছে? অবশ্য সম্রাট সময় সময় যে রাজ্যের অবস্থা অবগত হইতে না পারিতেন তাহা নহে; এতৎসম্বন্ধে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—"সময় সময় বাদসাহ ওয়াকিবনবিস প্রেরণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু কর্ম্মচারীগণের দৌরাত্ম্যে এবং দুর্ভাগ্য প্রজার দুরদৃষ্ট বশতঃ সম্রাটের সে সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিত না।"

বার্ণিয়ার বিচার ব্যভিচার সম্বন্ধেও যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকেদার নাথ মজুমদার।

কাট্‌নি ও জব্বলপুর।

—oo ✻✻✻ oo—

বহুদিন হইতে আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা একবার জব্বলপুর বেড়াইতে যাইব কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। আমাদের একজন বিশেষ আলাপী জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী কাট্‌নির ষ্টেশনমাষ্টার। তাঁহারই বিশেষ যত্নে এবার শারদীয়া পূজাবকাশে আমাদের জব্বলপুর বেড়ান হইল। ইনি কাট্‌নিতে বদলি হওয়া অবধি যখনই এলাহাবাদে আসিতেন তখনই আমাদিগকে বলিতেন "তোমরা একবার কাট্‌নিতে চল, দেখে এসো কেমন সুন্দর জায়গা; আর কাট্‌নি হইতে জব্বলপুর নিকটে, সেই সঙ্গে জব্বলপুরও বেড়িয়ে আস্‌তে পারবে।" শারদীয়া পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি এখানে আসিয়াছিলেন; আসিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন "এবার পূজার সময় তোমাদের কাট্‌নিতে যাইতে হইবে।" যাইবার সমস্তই ঠিক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যাবার সময় সময় আমাদের বাড়ীতে এমন একটা বিশেষ কাজ আসিয়া পড়িল যে সে কাজ না করিয়া গেলেই নয়; আবার তাহাকে সারিতে সারিতে পিতার ছুটী ফুরাইয়া গেল সুতরাং আমাদের শেষ আশাটুকু পর্য্যন্তও রহিল না। এবার আর যাওয়া হইবে না স্থির হইল। কাট্‌নি ও জব্বলপুর দেখাটা নাকি আমাদের অদৃষ্টে নিতান্তই ছিল তাই আবার আমাদের নির্ব্বাপিতপ্রায় আশার প্রদীপ একটু একটু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

ষষ্ঠী হইতে বিজয়া পর্য্যন্ত পাঁচটী দিন মাত্র পিতার ছুটী ছিল। যেদিন আমরা গেলাম সেদিন বিজয়া; সেই দিনই ছুটীর শেষ দিন। পিতা আরো পাঁচ দিনের ছুটী লইলেন। কাট্‌নি দেখিবার জন্য আমরা এত উৎসুক হই নাই যত জব্বলপুর দেখিবার জন্য হইয়াছিলাম; তাই ছুটী ফুরাইয়া গেলেও আবার ছুটী লইয়া, কোনরূপ বিঘ্ন বিপত্তি না মানিয়া আমরা সেইদিনই বেলা তিনটার ট্রেণে যাত্রা করিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা কাট্‌নি পৌঁছিলাম।

মনে করিয়াছিলাম রাত্রিটা পোহাইলে আমরা বেড়াইতে যাইব; কিন্তু তাহা হইল না। পরদিন সকালে ষ্টেশনের একটি বাবুর বাড়ী পুরুষদের নিমন্ত্রণ হইল, বৈকালে ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর বাড়ীতে ষ্টেশনের অন্যান্য সকল বাবুদের নিমন্ত্রণ হইল।

ষ্টেশনের ধারেই একখানি ছোট খাট পরিষ্কার বাঙ্‌লাতে ষ্টেশনমাষ্টার থাকেন। তিনি খুব অমায়িক ও সাদাসিদে লোক। কাট্‌নিতে যে সকল বাঙ্গালী আসেন সকলেই তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে অতিশয় আনন্দিত হন এবং অন্ততঃ একঘণ্টার জন্যও তাঁহার বাড়ীতে না থাকিয়া যান না। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল একটি কন্যা আর নিকট সম্পর্কীয়া একটি স্ত্রীলোক। মেয়েটির শ্বশুরালয় এলাহাবাদেই। যেদিন আমরা কাট্‌নি যাই সেইদিন এই মেয়েটি এবং তাহার দুইজন আত্মীয় আমাদের সহিত এলাহাবাদ হইতে কাট্‌নি গিয়াছিল। সেদিনটা বাড়ীতেই আমোদ প্রমোদে কাটান গেল।

তৃতীয় দিবস সকালে আমরা 'কাট্‌নি' নদীতে স্নান করিতে গেলাম। বাঙ্‌লা হইতে নদী বড় নিকটে নয়, একটু হাঁটিতে হয়। বাড়ী থেকে বাহির হওয়া গেল। দুধারে সবুজবর্ণ "কোদো"র ক্ষেতের মধ্য দিয়া উঁচু নীচু কাঁকুরে পথ দিয়া নদীর ঘাটে তো গিয়া পৌঁছিলাম। ওমা! নদীর ঘাট দেখেই তো প্রাণ শুখাইয়া গেল যে এই বিশ্রী কদাকার ঘাটে স্নান করিব কি করে। জলের উপর দুটা 'পান্‌চাক্কী'। পান্‌চাক্কী ঠিক হোল না, পানিচাক্কী। হিন্দিতে পানি অর্থে জল চাকী অর্থে কোন একটা গোলাকার বস্তু, যেমন গাড়ীর চাকা ইত্যাদি। ইংরাজী Water-mill এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জল-যাঁতা হইতে পারে কি? এদেশে যাঁতাকে চাক্কী বলে। এই পানিচাক্কী বা জলের যাঁতা মানুষের দ্বারা চালিত হয় না ইহা জলের দ্বারাই চালিত হয়। জলের ভিতর ভাটির মত পাথরের গাঁথুনি; সেটার উপরটা পাথর কিম্বা তক্তা দিয়া ঘরের ছাদের মত আচ্ছাদিত থাকে, তার উপর যাঁতা। সেই যাঁতার সহিত সংলগ্ন নীচের দিকে একটা খুব মোটা কাঠ ভাটির ভিতর থাকে। যে দিক দিয়া জল প্রবেশ করে সেই দিকে জল প্রবেশ করিবার পথ অপেক্ষা কিছু উঁচু একটা বাঁধের মত থাকে। নদীর জলটা বাঁধের উপর দিয়া আসিয়া জল প্রবেশের পথে খুব বেগে প্রবেশ করে। সেই জলের তোড়ে মোটা কাঠ

খানার সহিত যাঁতাটা ঘুরিতে থাকে। যাঁতার ঠিক উপরে একটা তলা-ফুটো মস্ত ঝুড়িতে পিশিবার আনাজ থাকে এবং সেই ছিদ্র হইতেই অল্প অল্প করিয়া আনাজ যাঁতার মুখে পড়ে। কাট্‌নি নদীটা অপ্রশস্ত, কিন্তু জল বেশ নির্ম্মল। সেখানে তো আমাদের স্নান করা হইল না, সেখান হইতে খানিক দূরে বাবাঘাট নামক একটা বাঁধানো ঘাট আছে, সেইদিকে আমরা চলিলাম। অদূরে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, তার তলায় একটি ছোট মন্দির দেখা যাইতেছে কিন্তু যতই হাঁটি ততই যেন আর পথ ফুরায় না। কখন 'বজ্‌রার' ক্ষেতের ভিতর দিয়া, কখন তিল গাছের উপর দিয়া, কখন বা উঁচু ঢিপির উপর, কখন কাঁটা বনের ভিতর দিয়া যাইতেছি, পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তপড়িতেছে; কখন সরিষার ক্ষেতের মধ্যে, কখন বা শুষ্ক চষা জমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। খানিকটা পথ আসিয়া আর পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার ফিরিলাম। যতটা চলিয়া আসিয়াছিলাম, আবার ফিরিয়া প্রায় ততটা যাইতে হইল। কি নিগ্রহ দেখ দেখি! সেদিনে আবার রোদ্‌টাই বা কি প্রচণ্ড! তা হোক্‌, বেড়াবার সাধ যাহাদের মনে এত প্রবল তাহাদের কি আর সেই রোদে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে? আমরা এবার সোজা সরল পথ পাইয়া অতি শীঘ্র গিয়া পৌঁছিলাম।

মন্দিরের পিছনে নদী। আমরা একবারেই ঘাটে গিয়া উঠিলাম। স্নান করিতে জলে নামিলাম। পায়ের আঙ্গুল গুলি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। খুব কম জল। জলের ভিতর ছোট বড় কত পাথর পড়িয়া রহিয়াছে, তা ব'লে কি নুড়ি পাথর, তা নয়। কোন খানে পাথর, কোন খানে কর্‌করে বালি, কোন কোন স্থানে আবার পাঁকও আছে, সে অতি অল্প। ঘাটের নীচে এক হাঁটু জল; ঘাট হইতে দশ বার হাত দূরে নদীর একটা পুল আছে তাহার নীচে এক বুক জল। সে নদীতে ইহার চেয়ে বেশী গভীর আর কোথাও নেই। বাবাঘাটের নিকট নদীটা ছাব্বিশ সাতাশ ফিটের অধিক প্রশস্ত নয়। নদীর এ পারে ঘাট হইতে অনেকটা উঁচু একটা অতি প্রকাণ্ড মাটীর ঢিপির উপর মস্ত এক অশ্বথ গাছের তলায় ছোট্ট একটি শিবের মন্দির; কেমন একটু ছোট্ট বাগান, একখানি আটচালা, একটি ছোট কুঠরী, আর ওপারে একটি প্রশস্ত অনুচ্চ

পাহাড়ের মত জমী। বড় গাছপালা সেটাতে নেই, কেবল সবুজবর্ণ ঘাসে আচ্ছাদিত, বোধ হইতেছে যেন একখানা সবুজ রংয়ের কার্পেটের দ্বারা তাহার জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক দেহখানি কে ঢাকিয়া দিয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা নির্ম্মল জলে খুব নাওয়া গেল। পুলের নীচে ছায়া পড়াতে আরো শীতল বোধ হইতেছিল। ঘাটে চার পাঁচ জন হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষ স্নান করিতেছিল। স্নানাদি হইয়া গেলে আমরা সেই মন্দিরে গেলাম। আটচালা খানির ভিতর একটি ফকির বসিয়া আছেন। আমরা যাইতে খাতির করিলেন, বসিতে জায়গা দিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া বসিলাম। আমাদের বিষয় অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাঁহার নিকট বাতাসা ছিল, দু দু খানি করে আমাদিগকে প্রসাদ দিলেন। আমাদের স্নান হইয়া গেলে ঘাটেই আমরা একটু একটু মিষ্টি খাইয়া জল খাইয়াছিলাম। সন্ন্যাসী প্রদত্ত বাতাসা পুনরায় খাওয়া গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সন্ন্যাসীঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন "মায়ি! যাও তোমরা একটি সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এসো; তিনি ঐ মন্দিরের ভিতর আছেন।" আমরা মন্দিরের ভিতর সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তাঁহার জ্বর হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম এই সন্ন্যাসিনীটী পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর স্ত্রী। ইহার স্বামী প্রথমে বৈরাগী হইয়া পালাইয়া আসিয়াছিলেন, বহু অনুসন্ধানের পর সন্ন্যাসিনীটী উঁহার নিকট আসিয়াছেন। এখন উভয়েই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ইহারা কতদিন হইল সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সন্ন্যাসীটি কতদিন হইল গৃহত্যাগী হইয়াছেন ইত্যাদি বিষয় জানিতে বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসীর পরিধানে একখানি চেলি, গলায় খুব এক গোছা রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটা আছে। যত বড় চুল জটাও ততবড়। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মত পরচুলা দিয়া জটা পাকানো নহে। দাড়ী আছে, বর্ণ কালো। দেখিবা মাত্রই যে আপনাপনি একটা ভক্তির উদয় হয়, ইহাকে দেখিয়া সেরূপ হইল না; অন্ততঃ আমার হইল না। কথা বার্ত্তা বেশ মিষ্টি। সন্ন্যাসিনীর পরিধানে গেরুয়া বসন; মাথায় খুব মস্ত জটা আছে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। শরীর অসুস্থ থাকাতে ইনি আমাদের সহিত বেশী কথা কহিতে পারিলেন না।

ইহারা অনেক দিন হইতে এখানে আছেন। এখানকার লোকেরা ইহাকে ‘বাবা’ ও ‘মায়ী’ বলিয়া সম্বোধন করে। সকলে ইহাদিগকে খুব মান্য ও ভক্তি করে। যাহারা মন্দির দেখিতে আসে তাহারা কিছু পয়সা সেই মন্দিরের মহাদেবকে দিয়া যায়। ইহাদের জীবিকা কি প্রকারে নির্ব্বাহিত হয় তাহা বলিতে পারি না। আগন্তুকেরা মহাদেবকে যে দু চার পয়সা চড়াইয়া যায় তাহাতেই যে চলে ইহাতো বোধ হইল না, কাট্‌নি এমন কিছু বড় সহর নহে যে প্রত্যহ সেখানে লোক আসিতে পারে, আর আমাদের মত বিদেশী যে প্রায়ই আসে তাহাও নয়। সেই সন্ন্যাসীর নামের অনুকরণে ঘাটের নাম ‘বাবাঘাট’ হইয়াছে।

সন্ন্যাসিনীর সহিত কথাবার্ত্তার পর আমরা বাগান দেখিতে গেলাম। বাগানে কিছুই নেই, কেবল পাঁচ সাতটা পেয়ারা ও আতার গাছ, দু চারটা গাঁদা ফুলের গাছ, মল্লিকা করবীও দু চারটা আছে। এই তো বাগান। বাগানটা নদীর দিকে। বড় অপরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। বাগানের চারি ধারে পাথরের দেওয়াল। একটি ছোট দোর আছে। দোরের নীচে পাথরের সিঁড়ি; এই সিঁড়ি ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাগান দেখিয়া আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। এবার আর মাঠের ভিতর দিয়া না গিয়া অন্য পথে গেলাম। এই পথটা রেলওয়ে লাইন পার হইয়া বরাবর কাট্‌নির বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাস্তাটা কাঁচা, এখন পাকা করিয়া প্রস্তুত হইতেছে। ইহার-ও দুধারে ক্ষেত, খোলা। বাবাঘাট হইতে আবার খানিক দূরে আরও একটি কোন ঠাকুরের মন্দির আছে। বড় বেলা হইয়া গেল বলিয়া আর সেখানে যাওয়া হইল না। ষ্টেশনের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া আমাদিগকে অন্য পথে যাইতে হইল। এই মাঠের উপর একটা ষ্টেশনের মত লাল বাড়ী আছে, পূর্ব্বে সেটাতেই বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ষ্টেশন হইবার কথা ছিল, সুবিধা না হওয়াতে কাট্‌নির ষ্টেশনেরই সহিত মিলিত করা হইয়াছে। বেঙ্গল নাগ-পুর রেলওয়ের একটা লাইন এই দিকে আসিয়াছে, সেখানে কেবল মাল গুদামের গাড়ীগুলা আসিয়া দাঁড়ায়। বেলা প্রায় বারটার সময় বাড়ী আসা গেল। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া কাটোয়া পাহাড় দেখিতে যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

তখন বেলা প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটা হবে, আমরা একখানি 'টাঙ্গা'তে করিয়া বেড়াতে বাহির হইলাম। কাট্‌নি সহরে দুজন মহাজনের দুখানি মাত্র টাঙ্গা আছে। মহাজনদের সহিত ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর আলাপ আছে; তিনি বলাতে একখানি পাওয়া গিয়াছিল। আর একখানির বলদ উপস্থিত ছিল না বলিয়া সময় মত আসিয়া জুটিতে পারিল না। এখন টাঙ্গা কি তাহা বলিতেছি। এই টাঙ্গাগুলা দেখিতে প্রায় কমিশেরিয়েটের গাড়ীর মত হয়। কমিশেরিয়েটের গাড়ী বড় হয়, এগুলা একটু ছোট; পিছনে দুজন, সম্মুখে দুজন বসিতে পারে। কমিশেরিয়েটের গাড়ীতে যেমন পিছন হইতে উঠে ইহাতেও ঠিক তেমনি করিয়া উঠিতে হয়। জব্বলপুরে এ গাড়ীর খুব চলন। সেগুলা ঘোড়াতে টানে; কাট্‌নিতে বড় বড় বলদে টানে। টাঙ্গাখানা বড় ছিল তাই আমরা পাঁচ জনে তাহাতে উঠিলাম। আমাদের পুরুষ সঙ্গীরা হাঁটিয়া আসিতে লাগিলেন। আমরা কাট্‌নির বাজারের বাহির দিক দিয়া গেলাম। বাজার, কাটোয়া-পাহাড়, ষ্টেশনের পশ্চিম পারে; ষ্টেশনমষ্টার বাবুর বাঙ্গলা পূর্ব্বপারে এবং বাঁধাঘাট প্রভৃতিও পূর্ব্বপারে। অদূরে সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে পাহাড়; আমাদের রাস্তার বাম দিকে চুণের ভাট্টা। এই চুণের কারখানা কিম্বা ভাট্টা সেখানকার অধিবাসী বাবু যদুগোপাল মিত্রের। রাস্তার দুই ধারে কেবল জোঁধ্‌রি, বজ্‌রার ক্ষেত। কলিকাতাবাসিনী পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন কাটোয়া পাহাড় বেড়াইতে আনিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাশয়াগণকে কেবল কঠিন শুষ্ক 'জোঁধ্‌রি' 'বজ্‌রা'র ক্ষেতের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি। তবু যদি ঐ শ্রুতিকঠোর নামগুলির বাঙ্গলা জানিতাম। মাঝে মাঝে আম জাম প্রভৃতি ফলের ও নানা প্রকার পার্ব্বতীয় বড় বড় গাছও ছিল। টাঙ্গা করিয়া অনেকটা দূর আসিয়া গাড়ী চলিবার আর পথ না থাকাতে আমরা একটা জায়গায় নামিলাম। সেখানটা একটি ছোট গ্রামের মত; পাঁচ সাত ঘর গোয়ালা আছে। একটি ছোট খাট আম বাগান আছে। সেই আম বাগানের নীচে নদী। এটাও কাট্‌নি; এইটাই ঘুরিয়া ওধারে গিয়াছে।

আমাদের সঙ্গীদের আসিয়া পৌঁছিতে দেরী দেখিয়া আমরা নদীর ধারে গেলাম। বাঁধানো ঘাট আছে, তবে এখন ভগ্ন প্রায়। ওদিককার নদী

অপেক্ষা এটা কিছু প্রশস্ত ও জলও তাহা অপেক্ষা গভীর। এখানেও একটা পান্‌চাক্কী চলিতেছে দেখিলাম। দশ বারটা পান্‌চাক্কী ছিল, সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবল ঐ একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। নদীর ভিতর এক একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া আছে ;জলের স্রোত তাহাতে আসিয়া লাগাতে খুব জোরে শব্দ হইতেছিল। নদীর দুধারে গাছপালা শোভিত অনুচ্চ পাহাড় ; স্থানে স্থানে পোড়ো জমী, কাঁটা ঘাস ঝোপ ঝাপে আবৃত ; ঘাটে কত স্ত্রীলোক বাসন মাজিতেছে, কেহ বা কাপড় কাচিতেছে, কেহ জল ভরিতেছে ; পুরুষেরা স্নান করিতেছে, জলে দাঁড়াইয়া একজন জপ করিতেছিল, ঘাটে বসিয়া বসিয়া এই সকল দেখিতেছিলাম এমন সময় আমাদের পুরুষ সঙ্গীরা আসিয়া পৌঁছিলেন। আমার পিতা আমাদের সহিতই ছিলেন, কারণ তিনি বৃদ্ধমানুষ এতটা দূর হাঁটিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে লইয়া টাঙ্গায় করিয়া আসিয়াছিলেন।

এবার আমরা সকলে হাঁটিয়া চলিলাম। পর্ব্বতপার্শ্বে সূর্য্য কেমন ধীরে অস্ত যাইতেছে আর তার উজ্জ্বল সোণালি রংয়ের কিরণ আকাশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে! পাহাড়ের উচ্চ শিখরে বড় বড় গাছগুলার মাথায় অল্প অল্প চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে ; নীচের সমতল ক্ষেত্র, পর্ব্বতের উপরের কাঁটার ঝোপ, লতাকুঞ্জগুলির কি মধুর রমণীয় দৃশ্য! এক একটি ছোট ছোট ঝোপ গাছে কত রকমেরই যে ফুল ফুটে আছে তা বলিতে পারি না। কোনটি লাল, কোনটি নীল, হলদে, সাদা, বেগুনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এক একটি ফুল ; একটি ফুলেতেও আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রং। এক গাছে এক রংয়েরও ফুল অনেক ফুটে আছে। এখানেও আমাদের পথ ভুল হইয়া গেল। এবারে আর ফিরিয়া না গিয়া যে দিকে পথ পাইলাম সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম। মনে হইতেছে আর দশ বার হাত গেলেই পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিব কিন্তু তা পৌঁছান যাইবে না। পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। যদিও পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, তবু বাঘের ভয়ে আমাদের 'কাটোয়া' পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না। কিছুদূর যাইয়া পাহাড়ের উপর একটা বাড়ী আছে, সেই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। এই বাড়ীটা একজন ফকিরের নির্ম্মিত। দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নীচে একখানি বড় 'হল' ;

হলের ভিতর হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। নীচের এই বড় হলটা বৈঠকখানা; গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা বাবাজি এই হলে থাকিতেন। দিনের বেলা গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু পাখা চলিত। ইঁহার সহিত অনেক বড় বড় লোকের ও রাজাদের আলাপ ছিল। যাঁহারা বাবাজিকে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলিলেন তিনি বড় ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী লোক ছিলেন; তাঁহার অনেক প্রশংসা করিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় এ স্থানে সর্ব্বদাই বিস্তর লোক সমাগম হইত,—আর এখন কেবল বন্য পশুর আবাসভূমি হইয়াছে! হলের বাহিরদিকেও উপরে উঠিবার একটা সিঁড়ি আছে; সেই সিঁড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। একটা বড় ছাদ; ছাদের দক্ষিণদিকে দুইটি ছোট ছোট ঘর নির্ম্মিত হইতেছিল কিন্তু হইয়া উঠে নাই। ছাদের সম্মুখে, পশ্চিমদিকে, একটা দালান; দালানের দুই পার্শ্বে ত্রিশ চল্লিশ হাত লম্বা ও পাঁচ ছয় হাত চৌড়া দুইটি গুহা আছে। এই দুই গুহার মধ্যস্থলে একটি ছোট ঘর। ঘরটিতে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠীত। যে স্থানে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সে স্থানকে মন্দির বলা যায় এবং মন্দির বলিলেই একটি গম্বুজাকৃতি চূড়া বিশিষ্ট ঘর স্বভাবতঃই আমাদের ধারণায় আসে, কিন্তু ইহা সেরূপ নয়। সচরাচর যেমন ঘর হয়ে থাকে তেমনিই চতুষ্কোণ একটি পাথরের ঘর। ঘরের ভিতর ভয়ানক অন্ধকার; দুরদৃষ্ট বশতঃ সঙ্গে আলো জ্বালিবার উপকরণ না থাকাতে মহাদেব দর্শন হইল না এবং গুহার ভিতরও দেখা হইল না। জ্যোৎস্নার একটু আভাতে ঘরের সম্মুখটা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে অতি অল্প দেখা যায়। যাহা দেখা গিয়াছিল, তাহতে বোধ হইল ঘরটি খুব ছোট আর ভয়ানক অপরিষ্কার। আমাদের সহিত একটী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক গিয়াছিলেন; তিনি যাইবার সময় বাজার হইতে মহাদেবকে চড়াইবার জন্য দু আনার বাতাসা লইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের সে কথা কাহারও মনে ছিল না। যাহা হউক, সেই বাতাসা মহাদেবকে চড়ান হইল। আমরাও তাহা হইতে কিছু কিছু প্রসাদ পাইলাম। কিছুক্ষণ ছাতে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। ছাতের উপর একটা প্রকাণ্ড অশথ ও একটা জাম গাছ আছে। এই বাড়ীটা অর্দ্ধেক নির্ম্মিত হইতে না হইতে বাবাজি মারা গিয়াছেন। ছাতের আলিসা একটু হইয়াছিল: দুটা ঘরের ছাদ হয় নাই, এরূপ অনেক স্থান

অর্দ্ধ নির্ম্মিতাবস্থায় পড়িয়া আছে। পাহাড়ের নীচে আম, জাম, কাঁটাল, লিচু, জামরুল, গোলাপজাম প্রভৃতি নানা প্রকার সুস্বাদু ফলের একটি বাগান; তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। বাগানের নীচে কাট্‌নি নদী, নদীর ওপারেও পাহাড়। উজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না অদূরে পাহাড়ের গায়ে ও নদীতে পড়িয়া স্থানটিকে বড়ই মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম এবং সংসার বিরাগীগণের উপযুক্ত বটে। এরূপ স্থানে আসিলে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ সংসারের শোক দুঃখ ও পাপের ভীষণ চিত্র হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া যায় এবং কেমন এক মধুময় শান্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে ও প্রাণ মন পুলকিত হয়। এ সুখ এ শান্তি কতক্ষণের জন্য? তখনি তো আবার আমাদের ফিরিতে হইল। রাত্রি অধিক হইতেছে, বাঘের ভয়, আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয় বলিয়া ফিরিলাম। এবার অন্যপথে গেলাম। মাঝে নদীর একটা শাখা সেইদিকে আসিয়াছিল। তাতে খুব কম জল, হাঁটিয়া পার হওয়া গেল। আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে টাঙ্গা ছিল; টাঙ্গাতে উঠিয়া আমরা বাজার দেখিবার নিমিত্ত বাজারের ভিতর দিয়া এলাম।

কাট্‌নির চক খুব বড় বটে কিন্তু অন্যান্য স্থানের চকের মত চতুষ্কোণ নহে। ইহা গোলাকার বলিয়া চতুষ্কোণ অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। কাপড় চোপড়ের দোকান, খেলানা পাতির দোকান তো একটিও দেখলাম না, তবে মাটির বাসন যথেষ্ট আছে। চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি পাওয়া যায়। তরকারী প্রায় সব রকমেরই পাওয়া যায়, তবে কপি, মটর সুঁটী ইত্যাদি কম পাওয়া যায় গোল গোল দেশী পটোল পাওয়া যায়, জামালপুরের পাটনার বড় বড় পটোল পাওয়া যায় না। মাছও প্রায় সকল প্রকারেরই পাওয়া যায়। চিংড়ী মাছ ও মাগুর মাছটাই বেশী। রুই প্রভৃতি কখন কখন আসে। ইলিস মাছ সেখানে নাই। দুধ, ঘীটা শস্তা। বাজারের ভিতর মহাজনদের ও শেঠের বাড়ী দেখিলাম। কাট্‌নির চকের মত নাকি এমন সুন্দর চক আর কোথাও নেই কেবল জয়পুরে আছে। অবশ্য জয়পুরের চক ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর; কিন্তু গঠন উভয়েরই এক প্রকার। এই চকটী সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের কমিশনার Morris সাহেবের দ্বারা স্থাপিত। কাট্‌নিতে মহাজন বিস্তর আছে। বাজা-

রের ভিতর গিয়া দেখ চাল, ডাল, গম, মুগ, কলাই রাশি রাশি নানা প্রকারের শস্য রহিয়াছে। এখানে শস্যের কাট্‌তি খুব। এখান হইতে কত দেশ দেশান্তরে এই সকল শস্য চালান হয়। এক প্রকার লাল বর্ণের চূর্ণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা কড়িকাট, দোর, জানালা পেণ্ট Paint করিবার বেশ রং প্রস্তুত হয়। এই লাল বর্ণের চূর্ণ মাটীর ভিতর জন্মে। স্থান বিশেষের মাটী খুঁড়িলেই পাওয়া যায়। ধরিতে গেলে ইহা এক প্রকার খনিজ পদার্থ—(Oxide of iron ore)। এখানকার চূণের কারখানা প্রসিদ্ধ। একজন বাঙ্গালীর এবং কয়েকজন ইংরাজের কয়েকটা চূণের কারখানা আছে। এই কারখানার গঠন প্রণালী যে কিরূপ তাহা বলিতে পারিলাম না; কারণ আমরা নিকটে গিয়া দেখিবার সুবিধা পাই নাই। দূর হইতে একটা প্রকাণ্ড অত্যুচ্চ দ্বার শূন্য গৃহের মত। যেমন তেমন পাথর পোড়াইলেই চূণ হয় না। এ পাথর মাটীর ভিতর জন্মায়। এ পাথর নাকি অন্যান্য পাথর অপেক্ষা নরম। ইহাও মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাওয়া যায়। এই লাইম্ ষ্টোন (Lime Stone) হইতে হাজার হাজার টন্ চূণ প্রস্তুত করিয়া ইংরাজেরা ভারতবর্ষের দেশ দেশান্তরে চালান দেয়। ইহাই আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ 'কাট্‌নি লাইম্'। ইহা একটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। আমাদের দেশের লোকেরা যদি এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন্ তাহা হইলে বিলক্ষণ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন, কারণ এখানকার ইংরাজ বণিকেরা এই ব্যবসা করিয়া সকলেই ধনী হইয়াছেন। নিকটবর্ত্তী অনেকস্থানে লাল পাথরও (Red sand Stone) পাওয়া যায়। এই প্রদেশে অনেক প্রকারের খনি আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। সম্প্রতি কাট্‌নি হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বেঙ্গল নাগপুর রেলের উমারিয়া নামক একটা ষ্টেশনের নিকট একটি কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সহরের নাম কাটোয়া পাহাড়ের নামের অনুকরণে হইয়াছে। কাটোয়া পাহাড় উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত কাটা, সেইজন্য ইহার অপর একটি নাম 'কাট্‌নি মুড়োয়ারা'। অতএব এই স্থানকে 'কাট্‌নি মুড়োয়ারা' এতটা না বলিয়া সংক্ষেপে 'কাট্‌নি' বলে।

যাহা হউক, বাজার দেখিতে দেখিতে আমরা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের অপর পারে আমাদের বাঙলা। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ষ্টেশনের

অনতিদূরে একটা চিকিৎসালয়, একটি হিন্দী Middleস্কুল, একখানা ডাক বাঙলা ও দেশীয় লোকদের থাকিবার জন্য একটি সুপ্রশস্ত সরাই আছে।

ক্রমশঃ

শ্রী সরযূ বালা দত্ত।

যজ্ঞ ও আহার।

—০* ** *০—

পুরাকালে অগ্নি হব্যবাহন ছিলেন। দেবতাদিগের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দানই সেকালে ঋষিদিগের কার্য্য ছিল। কিন্তু ক্রমে যত মনুষ্য জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইতে লাগিল তত অগ্নির দ্বারা কেবল দেবোদ্দেশে হবিপ্রেরণ কার্য্যে লোকের তৃপ্তি হইল না। পূর্ব্বে অগ্নি হবির্ভুক ছিলেন ক্রমে অগ্নি সর্ব্বভুক হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অগ্নিকে সর্ব্বভুক প্রথম করিল কে? তাহাও দেখা যায় ভৃগু। ভৃগু বাক্যে হব্যবাহন অগ্নি সর্ব্বভুক হইয়াছিলেন। * যে ভৃগুকুলে চ্যবনের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ মুনি জন্মিয়াছিলেন সে বংশ যে অগ্নিকে সর্ব্বভুক করিয়া তুলিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনিই কাশরোগের অদ্বিতীয় ঔষধ চ্যবনপ্রাশের উদ্ভাবক। অগ্নিকে ভৃগুবংশীয়েরা সর্ব্বভুক করিয়াছিলেন ইহার অর্থ এই যে অগ্নিতে ক্রমে সকল দ্রব্যই পরীক্ষিত হইতে লাগিল। আয়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত রাসায়নিকদিগের অগ্নিতে কেবল ঘৃত নিক্ষেপ করিলে চলিবে না, অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্যই আয়ুর্ব্বেদের জন্য

---

* "তুমি সর্ব্বভক্ষক হইবে" এই বলিয়া ভৃগু অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পরীক্ষা করা চাই। বিজ্ঞানবিৎ অগ্নিবংশীয়েরা আহারাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানকে মান্য করিয়া চলিতেন। কোন খাদ্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত হইলে (তাহা লোক প্রচলিত হউক বা না হউক) অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহাদিগের রসনা সে সকল দ্রব্যের রসাস্বাদে অগ্রসর হইত। মহর্ষি ভৃগু অগ্নিকে সর্ব্বভুক করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার ফলে তৎপুত্র চ্যবন মুনি চ্যবনপ্রাশ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, যাহার উপকার আজও আমরা যুগযুগান্তর পরে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছি। চ্যবনপ্রাশের ন্যায় ঔষধগুলির নামেই বুঝা যায় যে এইগুলি অনেকটা আহার বলিয়াই পরিগণিত হইত। আহার হিসাবে নাম হইয়াছে চ্যবনপ্রাশ, প্রাশ অর্থে খাদ্য। প্রকৃত পক্ষে ভৃগুই সেকালের লোকপ্রথার বিরুদ্ধে হব্যভুক অগ্নিকে সর্ব্বভুক করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানবোপযোগী নানা সুখাদ্য ও ঔষধাদির আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কি মাংস কি মৎস্য কি অবিদিত-গুণ ওষধিসমূহ যাহা ঋষিরা প্রথমে আস্বাদন করিতে সাহসী হন নাই অগ্নিকুল অগ্রণী হইয়া অগ্নির সহায়ে সে সকল অবাধে লোক-প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

অগ্রং গচ্ছন্তি ভূতানাং যেন ভূতানি নিত্যদা।
কর্ম্মস্বিহ বিচিত্রেষু সোগ্রণী বহ্নিরুচ্যতে। *

নানা বিচিত্র কর্ম্মে অগ্নিকুলই সকলের অগ্রণী ছিলেন। এই অগ্নিকুলেরই চেষ্টার ফলে নানাবিধ মৎস্য, মাংস ও ওষধি সমূহের গুণাগুণ আয়ুর্ব্বেদে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে দেখিতে পাই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ চরকসংহিতা। চরকসংহিতা 'অগ্নিবেশ তন্ত্র' নামেও অভিহিত হয়। অগ্নিবেশ ঋষির নামেই বুঝা যায় না কি যে ইনিও অগ্নিকুল প্রসূত। যে মৎস্য বঙ্গবাসীর এত প্রিয় খাদ্য তাহাও সুসভ্য মানব সমাজে আহার্য্যরূপে প্রথম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন অগ্নিকুল। মহাভারতে স্পষ্টই লিখিত আছে "অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া

* বনপর্ব্ব ত্রিংশতাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বলিলেন, মৎস্যগণ বিবিধ প্রকারে শরীরিগণের ভক্ষ্য হইবে।" *

মৎস্যাস্তস্য সমাচক্ষ্যুঃ ক্রুদ্ধস্তানগ্নিরব্রবীৎ।
ভক্ষ্যা বৈ বিবিধৈর্ভাবৈর্ভবিষ্যত শরীরিণাম †

দেবতাদিগের কালে অগ্নির দ্বারা দুগ্ধসার হবি প্রস্তুত হইত, তখন আহার বিজ্ঞানের এই পর্য্যন্ত উন্নতি। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে অগ্নির সাহায্যে কত নূতন নূতন খাদ্যপাক মানবআহার্য্যের শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল।

দেবযুগের পরবর্ত্তী কালে প্রথম প্রথম ভারতের ঋষিরাও দেবগণের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষফল, সোমরস ও হবি প্রভৃতি দেব-প্রচলিত খাদ্যসমূহ ব্যবহার করিতেন এবং ঐ সকল দ্রব্যই দেবোদ্দেশে আহুত হইত। কিন্তু যখন অগ্নি সর্ব্বভুক রূপে পরিগণিত হইল তখন কোন বস্তুই অগ্নির আর ভক্ষণ করিতে বাধা রহিল না। অগ্নির সঙ্গে অগ্নিবংশীয় ঋষিরাও সর্ব্বভুক হইয়া উঠিলেন। এইরূপে শস্যপূর্ণ ওষধিবহুল ভারতভূমিতে আসিয়া অগ্নি-ঋষিরা অগ্নির সাহায্যে নব নব ওষধিসমূহের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রধানতঃ অগ্নিবংশীয় ঋষিদিগের দ্বারা ভারতের খাদ্যোপযোগী ওষধিসমূহ খাদ্যরূপে প্রচলিত হইল এবং যে সকল ওষধিতে রোগারোগ্যের গুণ দৃষ্ট হইল, তাহা ঔষধের শ্রেণীভুক্ত হইল। ওষধি হইতেই ঔষধ কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। দেবখাদ্য হবির সহিত ওষধি প্রভৃতির সম্মিশ্রণে যেমন একদিকে অপূপাদি হবির্পক্ক খাদ্যসমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল সেইরূপ অন্যদিকে রাসায়নিক ঔষধ সমূহও আবিষ্কৃত হইতে চলিল। প্রথম প্রথম হবির দ্বারাই যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইত কিন্তু এই সকল সুস্বাদু খাদ্য আবিষ্কৃত হইবার পর

---

* অগ্নির ক্রোধবাক্যে মৎস্য খাদ্যরূপে প্রচলিত হইয়াছিল একথায় অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখি না। মুসলমান ধর্ম্মের নায়ক মহম্মদের ক্রোধবাক্যে কাঁকড়া ও শূকর যদি মুসলমান সমাজে অখাদ্যরূপে পরিগণিত হওয়া সম্ভব হয় তবে ঋষিকুলের নেতা অগ্নির ক্রোধ বাক্যে আর্য্যদিগের মধ্যে মৎস্য খাদ্যরূপে কেন না প্রচলিত হইতে পারে?

† মহাভারত বনপর্ব্ব একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হবির্পক্ক খাদ্যসমূহও ক্রমে যজ্ঞে প্রবেশ লাভ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে শ্রদ্ধাসহকারে দেবারাধনার কারণে হবি উৎসর্গ হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি। এই যজ্ঞ ক্রমে শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনকালে যজ্ঞ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল;—শ্রৌত ও গৃহ্য। তাহার মধ্যে গৃহ্য যজ্ঞ আবার তিনটী উপবিভাগে বিভক্ত;—দৈনিক পঞ্চযজ্ঞ, বিবাহাদি সংস্কার যজ্ঞ ও পাক-যজ্ঞ। দৈনিক পঞ্চ যজ্ঞ প্রতিদিন আচরণ করা বিধি এবং সংস্কার যজ্ঞ উপবীত বিবাহাদি বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্মে অনুষ্ঠান করা বিধি। পাকযজ্ঞগুলি পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্ব দিনে এবং ঋতুতে ঋতুতে অনুষ্ঠেয়। এই পাকযজ্ঞের সহিত আহার পাকের যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা 'পাকযজ্ঞ' নামেই বুঝা যায়। ঋতু পরিবর্ত্তনে যে নব নব শস্য ও ওষধির আবির্ভাব হয় তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহারের জন্যই পাকযজ্ঞ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। পাকযজ্ঞের বিধানে শরৎ, হেমন্ত শীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুর অনুসারী বিচিত্র খাদ্যভার প্রস্তুত করিয়া ঋষিরা পাকযজ্ঞোৎসব সুসম্পন্ন করিতেন। শরতের আরম্ভাবধি শীতের শেষ পর্যন্ত পাকযজ্ঞের বিশেষ কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। এই কালে ওষধি ও শস্যসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাই পাকযজ্ঞের উপযুক্ত কাল। শরতের প্রারম্ভে শ্রাবণ মাসে "শ্রবণাকর্ম্ম", আশ্বিন মাসে "আশ্বযুজী কর্ম্ম", অগ্রহায়ণে "নবযজ্ঞ" ও পৌষ ও মাঘে "অষ্টকাদি" কৃত্য বিশেষভাবে পাকযজ্ঞের অঙ্গীভূত ছিল। এই সকল ক্রিয়াকর্ম্মের সময়ে দর্শক, পরিজন, ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে হোমাবশিষ্ট খাদ্যসমূহ যথাভাগ খাওয়ান হইত। অগ্রহায়ণে 'নব যজ্ঞ' সুসম্পন্ন করিবার কালে যে নিয়ম পালিত হইত তাহা বৈদিক গৃহ্যসূত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"হবিরুচ্ছিষ্টশেষং প্রাশয়েদ্ যাবন্ত উপেতাঃ স্যুঃ।

'উচ্ছিষ্টশেষম্' উৎসর্গীকৃতস্য শেষং 'হবি' 'যাবন্তঃ' দর্শকাঃ পরিজনা নিমন্ত্রিতাশ্চ 'উপেতাঃ' তত্রাগতাঃ 'স্যুঃ' তান্ সর্ব্বানেবাবিশেষেণ 'প্রাশয়েৎ'

"উৎসর্গীকৃত হবির অবশিষ্ট লইয়া তত্রাগত দর্শক, পরিজন, নিমন্ত্রিত সকল-

কেই যথাভাগ খাওয়াইবে"। *

অধিকাংশ আধুনিক হিন্দু উৎসবগুলির মূলে প্রাচীন কালের পাকযজ্ঞোৎসব বিদ্যমান। কোনটী বা পাকযজ্ঞের অপভ্রংশ কোনটী বা উহার নব সংস্করণ মাত্র। যেমন শ্রবণাকর্ম্ম "পৌর্ণমাস্যাং কৃত্যম্"। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে প্রথম শ্রবণাকর্ম্ম করিতে হয়। বর্ত্তমান কালের হিন্দুস্থানের 'রাখীবন্ধন' এই প্রাচীন শ্রবণা কর্ম্মের নব সংস্করণ মাত্র। এইরূপ নব্যতন্ত্রের দুর্গা পূজা, কোজাগরীকৃত্য প্রভৃতি প্রাচীনকালের আশ্বিনী পূর্ণিমায় পালনীয় 'আশ্ব-যুজী কর্ম্মের' স্থান অধিকার করিয়াছে।

এক্ষণে যেমন 'দুর্গাপূজা'র কালে সমস্তই শিব লইয়া ব্যাপার সেইরূপ আশ্বযুজীকর্ম্মেরও নায়ক রুদ্রদেবতা।

"আশ্বযুজ্যাং পৌর্ণমাস্যাং পৃষাতকে পায়সশ্চরু রৌদ্রঃ।

"আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে পৃষাতক অর্থাৎ ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক রুদ্র দেবতাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পায়স চরু পাক করিবে।" বৈদিক 'নব যজ্ঞের' নব সংস্করণ অধুনা কালের 'নবান্ন'। বৈদিক কালের 'অষ্টকাকর্ম্মের' স্থলে 'পৌষ পার্ব্বণ' প্রভৃতি অধিকার করিয়াছে ইত্যাদি। †

ইহাতে বুঝা যাইতেছে 'পাকযজ্ঞ' এককালে বড় অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। শ্রাবণ অবধি মাঘ ফাল্গুন পর্য্যন্ত কয়েক মাস এই পাকযজ্ঞোৎসবের কারণে আজও হিন্দুর চক্ষে পুণ্য মাস। আমাদের 'পুণ্যাহ' প্রথার মূলে এই পাকযজ্ঞোৎসব। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে 'পুণ্যাহ' সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৈদিক শ্রবণাকর্ম্মই বৎসরের প্রথমে নানা পুণ্যোৎসবের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় বলিয়াই ইহা বিশেষ ভাবে 'পুণ্যাহ' নামের অধিকারী। হোমাদির দ্বারা সুবৃষ্টি হইয়া কিসে শস্যাদি ভালরূপে উৎপন্ন হয় ও ওষধিসমূহ ফলগর্ভ হয় এবং শস্যাদি ভালরূপে জন্মিলে কিসে তাহার সদ্ব্যবহার হয় পাকযজ্ঞের তাহাই লক্ষ্য। এই সকল যজ্ঞ কর্ম্মের জন্যই

---

* গোভিল গৃহ্যসূত্র।

† আধুনিক উৎসব ও পাকযজ্ঞের সম্বন্ধ বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

শ্রাবণ অবধি মাঘ পর্য্যন্ত এই কয় মাস হিন্দুর নিকটে পুণ্য মাস রূপে চিরকাল পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

‘শ্রবণাকর্ম্মের’ অব্যবহিত পূর্ব্বে পাকযজ্ঞের অঙ্গীভূত ‘লাঙ্গল যোজন কর্ম্ম’ও বৈদিককালে অনেকে সম্পন্ন করিতেন। হিন্দু জমীদারেরা আষাঢ় মাসে যে সচরাচর ‘পুণ্যাহ’ কৃত্য সম্পন্ন করেন তাহা প্রকৃতপক্ষে এই ‘লাঙ্গলযোজন-কর্ম্ম’। ঋষিরা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সুফল লাভের আশায় চন্দ্র-তারানুকূল পুণ্য দিবসে ইহা সম্পন্ন করিতেন বলিয়া ইহা ‘পুণ্যাহ’ নামের অধিকারী হইয়াছে।

“পুণ্যাহে লাঙ্গলযোজনং জ্যেষ্ঠয়া বৈন্দ্রদৈবত্যাম্;”

“পুণ্যাহে অর্থাৎ শুভ নক্ষত্রাদিযুক্ত দিবসে ‘লাঙ্গলযোজন কর্ম্ম’ সম্পন্ন করিবে। অথবা পুণ্যাহে ইহা সম্পন্ন না করিতে পারিলে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত দিবসেও সম্পন্ন করিতে পার, কারণ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ‘ইন্দ্র দৈবত’ এবং কৃষি-কার্য্য ইন্দ্রায়ত্ত।” লাঙ্গল যোজনকৃত্য হোমাদি সমাপনান্তে যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে বৈদিক ঋষি পারস্কর তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। ‘ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্’ *

যে নিঃস্বার্থপর দেব শ্রদ্ধা হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে দ্বিজেরা যজ্ঞের সে নিঃস্বার্থপরতা ও পবিত্রতা স্থিরতর রাখিতে চির দিন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। যজ্ঞকালে আহারাদির দ্বারা লোকসেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের দ্বারা শ্রদ্ধা প্রীতি প্রভৃতি সৎবৃত্তি চর্চ্চার প্রকৃষ্ট পথ খুলিয়া গিয়াছেন। সকল বস্তুই অসৎ লোকের হস্তে পড়িলেই তাহা অসদ্ভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ হয়।

---

* শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে উৎসাহ নামক মাসিক পত্রে (১৩০৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায়) ‘পুণ্যাহ’ শীর্ষক প্রবন্ধে পুণ্যাহ প্রথার উৎপত্তি কাল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ‘পুণ্যাহ’ সংস্কৃত নামটী দেখিয়া ইহা যে হিন্দু আমলে প্রবর্ত্তিত তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে মনে আসে, কিন্তু অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন—“মুর্শিদ কুলি খাঁর আদেশে শুভ পুণ্যাহের সূচনা হয়।” ‘পুণ্যাহ’ মুসলমান আমলে যে প্রচলিত হয় নাই বৈদিক যুগে যে ইহার সূত্রপাত এক্ষণে পাঠকের তাহা বুঝিতে আর বাকী নাই।

যজ্ঞেরও মধ্যে যে সে অসদবস্থা হয় নাই তাহা নহে। এই পাশ্চাত্য যুগে যেমন বিজ্ঞানের দ্বারা লোকের ভূরি ভূরি উপকার হইতেছে সত্য, কিন্তু এমনও বৈজ্ঞানিকেরা আছেন যাঁহারা এই বিজ্ঞানকে সহায় করিয়া নানাবিধ মানুষ মারিবার যন্ত্র উদ্ভাবনে যত্নবান সেইরূপ প্রাচীনকালেও কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোকের হস্তে পড়িয়া যজ্ঞাদিও কতকাংশে বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমনও কতকগুলি লোক ছিলেন যাঁহারা এই যজ্ঞের দ্বারা জনসমাজের কিসে অনিষ্ট হয় তজ্জন্য সচেষ্ট ছিলেন। যজ্ঞাদির দ্বারা লোক ধ্বংস করিবার উপায়ও সেকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অথর্ব্ববেদেই ইহার অধিক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পরের অনিষ্টকারক যজ্ঞ ও মন্ত্রাদির বিষয় অথর্ব্ববেদে স্থানলাভ করিয়াছে বলিয়াই মুনি সমাজে অথর্ব্ববেদ চির দিন নিম্ন আসন পাইয়াছে।

ঋষিরা যজ্ঞকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া সুবিবেচনারই কার্য্য করিয়াছেন। যজ্ঞ সেকালের ধর্ম্মসাধন ছিল। দেবতা পিতৃ অতিথি এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদিগের পরিতৃপ্তির জন্য ঋষিদিগের সকল চেষ্টা। তাঁহারা ভাবিতেন যে নিঃস্বার্থভাবে সকলকে পরিতৃপ্ত করিলে নিজে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। তাই তাঁহাদিগের নিয়ম ছিল সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া অবশেষটুকু গৃহস্থেরা আহার করিবেন।

দেবানৃষিন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ গৃহ্যাশ্চদেবতাঃ
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্গৃহস্থ শেষভুগ্ ভবেৎ॥

অতএব দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ ও আহার এই দুইটী কার্য্য, ঋষিপরিবারে সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় এক সূত্রে আবদ্ধ ছিল; এই কারণেই দেখিতে পাই, যজ্ঞের দ্বারা সূপশাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যে সকল মিষ্টান্ন ও অন্নব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হই, তাহাদিগের অনেকগুলি যজ্ঞের কল্যাণে জন্মলাভ করিয়াছে। একালে যজ্ঞাদির বড় একটা প্রভুত্ব নাই, আহারই সর্ব্বতোভাবে যজ্ঞের স্থান অধিকার করিয়া শোভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞীয় উপকরণ এক্ষণে আহার্য্যের উপকরণে পরিণত।

যজ্ঞ কেবল এইরূপে যে ভারতেরই খাদ্যোন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে

তাহা নয়, এমনকি, আমরা যে সকল দেশীয় খাদ্য এবং খাদ্যোপকরণ মুসলমান বা য়ুরোপীয় প্রতিভার ফল বলিয়া জানি, সে সকলেরও অনেকগুলি যজ্ঞমূলক। প্রাচীনকালে ভারতের যাগযজ্ঞই দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই সেই সকল দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে নব নব যজ্ঞীয় খাদ্যাদিও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এসকল বিষয়ে ক্রমে প্রমাণ সহকারে পাঠকের গোচর করিব।

প্রাচীনকালে যজ্ঞ ও আহার যে একসূত্রে গ্রথিত ছিল, আহার শব্দটীও তাহার প্রমাণ। আহার শব্দটী প্রকৃত যজ্ঞ সম্পর্কীয় শব্দ; ইহা যজ্ঞ সম্বন্ধেই অধিক ব্যবহৃত হইত। সেকালে বনে বনে যজ্ঞের জন্য এবং যজ্ঞাবশেষ আহারের জন্য ফল মূল প্রভৃতি ও সমিধভার আহরণ করিয়া আনিতে হইত। এক্ষণে যদিও বনে বনে আহরণ করিয়া বেড়াইতে হয়না, কিন্তু এক্ষণেও বিনা আহরণে আহার্য্য লাভ করা সুকঠিন। ঋষিদিগের আহৃত বনজ শাকশবজিগুলি অধিকাংশ শবুজ রঙ্গের হইত বলিয়া শবুজ রংও হরিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে;—আহরণ বা হরণ হইতেই হরিত শব্দের উৎপত্তি। আহরণ শব্দের সমগোষ্ঠীয় শব্দ আমরা য়ুরোপীয় ভাষাতেও দেখিতে পাই। ইংরাজী 'আরণ' (Earn) শব্দটী সংস্কৃত আহরণ শব্দেরই বংশধর। ইংরাজি 'আরণ' শব্দটী স্যাক্সন 'আরনিয়ান' (Earnian) বা জর্ম্মণ 'আরন্টেন' শব্দ হইতে আসিয়াছে; ইহার অর্থ শস্যাদি সংগ্রহ করা—আহরণ শব্দেরও ঐ একই অর্থ। শুদ্ধ আহার শব্দ নয়, আহারার্থ অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দেরই অনুরূপ শব্দ আমরা য়ুরোপীয় ভাষায় প্রাপ্ত হই। অনেকেই জানিতে পারেন, ভোজনার্থ অদ্‌ ধাতুর অনুরূপ শব্দ লাটিনে 'ইডো' (Edo) ইংরাজিতে 'ইট' (Eat), স্যাক্সন ইটান (Etan) ইত্যাদি। সংস্কৃত অশন শব্দেরও তুল্য শব্দ আমরা জর্ম্মন ভাষায় এস্‌সেন (Essen) শব্দ পাই। এমন কি, যে 'ডিনার' (Dinner) শব্দের আমরা অনুবাদ করি, 'মধ্যাহ্ন ভোজন,' সেই ডিনারকে জর্ম্মনরাও 'মধ্যাহ্ন ভোজন' বলে। ডিনারকে জর্ম্মন ভাষায় 'মিট্টাগস্‌ এস্‌সেন' (Mittags essen) বলে; মিট্টাগস্‌ অর্থে মধ্যাহ্ন এবং এস্‌সেন অর্থে অশন বা ভোজন। অশন অদন এবং আহরণ, এই শব্দগুলি বৈদিক কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। বেদমন্ত্র এবং বৈদিক গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থপ্রভৃতিতে

বহুস্থলে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। গৃহ্যসূত্রে সায়মাশ ও প্রাতরাশ শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। * "নিষ্ঠিতে সায়মাশ প্রাতরাশে ভূতমিতি প্রবাচয়েৎ" প্রাতরাশ এবং সায়মাশ অনুষ্ঠিত হইলে পর (ছাত্রগণকে) অধ্যয়ন করাইবে।

অগ্নিকে যেমন ভারত সকল বিষয়ে অগ্রণী করিয়া চলিতেন, অগ্নিও তাহার প্রতিদানস্বরূপ ভারতকে সকল বিষয়ে সকলের অগ্রণী করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন অজ্ঞানান্ধকারে তখন এক অগ্নিই ভারতকে আলোকিত করিয়াছিল, বলিতে হইবে। অগ্নি-সংসৃষ্ট যাগযজ্ঞই যে প্রাচীনকালে সকল বিষয়েই ভারতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, ভারতের ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমাদিগের অনেকটা একমত; তিনি যাহা বলেন, তাহা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"নানাবিধ যজ্ঞই প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল, এবং হিন্দুগণ নানা শাস্ত্রে যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন, তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠানমূলক। যজ্ঞসম্পাদনার্থ সূর্য্য চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। যজ্ঞে বিশুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার উদ্দেশে তাঁহারা যে নিয়মগুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাহা হইতে 'দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা' এবং বাক্যরচনের উৎপত্তি, এবং যজ্ঞসম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইত, তাহারই নিয়মসমূহ হইতে জগতে জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি।"

পূর্ব্বেই একরূপ বলিয়া আসিয়াছি যে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, যাহা দেশে বিদেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের বীজ বপন করিয়াছে, তাহা যজ্ঞেরই ফলমাত্র; কারণ যজ্ঞহোম প্রভৃতি যে অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব, সেই অথর্ব্ববেদই আবার আয়ুর্ব্বেদের

---

* আমরা প্রাতঃকালীন ভোজনকে 'প্রাতরাশ' বলি, কিন্তু সায়ংকালীন ভোজনকে 'সান্ধ্য ভোজন' শব্দের দ্বারা সচরাচর ব্যক্ত করি। কিন্তু বোধ হয়, সান্ধ্যভোজন অপেক্ষা বৈদিক 'সায়মাশ' শব্দ ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়।

জন্মদাতা। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদকে স্পষ্টই অথর্ব্ববেদের অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।—

"অথর্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান" (ভাব প্রকাশ)

প্রকৃত কথা এই যে যজ্ঞের জন্য ঋষিদিগকে ওষধি ও ফল মূল প্রভৃতি অরণ্য হইতে আহরণ করিয়া আনিতে হইত, এবং তাহারই ফলে নব নব ওষধি ও ফল মূল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া ঋষিসভায় তাহাদিগের গুণাগুণও পরীক্ষিত হইয়া যাইত। তাই ভারতের আয়ুর্ব্বেদে আমরা যেমন ফল মূল প্রভৃতির প্রত্যেকটীর গুণাগুণ বিশদরূপে জানিতে পারি, এমন আর কোন বিদেশীয় গ্রন্থের দ্বারা জানিতে পারি না।

কিন্তু ঋষিরা অগ্নির প্রতি এত অধিক শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রকাশ করাতে অনেকে ভ্রমে পতিত হয়েন যে, তাঁহারা অগ্নিপূজক ছিলেন। কিন্তু ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক জাতিকে যখন দেখি যে তাঁহারা অগ্নি-পূজক না হইয়াও ঐ একই কারণে অগ্নির প্রতি অতি প্রাচীনকাল হইতে শ্রদ্ধা সমর্পণ করিয়া আসিতেছেন, তখন এ ভ্রম দূর হইবারই কথা। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যদিগের ন্যায় পারসীকেরা ঈশ্বর বা উপাস্য দেবতা বলিয়া অগ্নির পূজা করেন না; অগ্নিকে ঈশ্বরসৃষ্ট মঙ্গলজনক ও পবিত্র বস্তু বলিয়া সমাদর করেন, এবং অগ্নিহোত্রিদিগের ন্যায় গৃহে, দেবমন্দিরে, চিরদিন অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকেন। জেন্দ ভাষায় অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত আঁকেতিল দুপের্ঁ (anquetil du peron) পারসীকদিগের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বলিতেছেন, "পারসীকেরা প্রথমাবধি আজি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত একেশ্বরের উপাসনা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহারা যে অগ্নি ও সূর্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহার জন্য একথা কখনই বলা যাইতে পারে না যে, তাহারা ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকে; কারণ উহাদিগের প্রধান গুরু জোরোষ্টর উহাদিগকে উপাসনার সময় অগ্নি বা সূর্য্যের সম্মুখে ফিরিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের উপাসনার প্রার্থনাগুলি দেবদেব একেশ্বরেরই উদ্দেশে করা হয়, অগ্নি প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া নহে।" পারসীকেরা যে নিরবচ্ছিন্ন একেশ্বরের উপাসক এ বিষয় ফর্ব্বস, সর উইলিয়ম আর্ডসলি, ডাক্তার হাইড প্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরাই একমত, এবং পারসিকেরা স্বয়ং ইহার জন্য গৌরব করিয়া

থাকেন। কোন পারসীক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "Ask a parsee whether he is a worshipper of the sun or fire and he will emphatically answer—No! There is no doubt of their being monotheists, they tolerate no other worship but that of the supreme being." পারসীকেরা সূর্য্য এবং অগ্নিকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাহা কেবল সূর্য্য ও অগ্নি জগতের শুভকারী বলিয়া এবং পবিত্র তেজোমূর্ত্তি জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে স্মরণপথে আনয়ন করে বলিয়া। এই একই কারণে অগ্নির সম্মুখে ঈশ্বরোপাসনা পারসীকদিগের ন্যায় হিন্দুদিগেরও ধর্ম্মবিধি আছে। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিতেছেন,—

গৃহেষু তৎসমং জপ্যং গোষ্ঠে শতগুণং ভবেৎ।
নদ্যাং শত সাহস্রন্তু অনন্তমগ্নিসন্নিধৌ॥

"গৃহে গায়ত্রী জপ করিলে যে ফল হয়, গোষ্ঠে করিলে তাহার শত গুণ ফল হয়। নদীতে জপ করিলে লক্ষ গুণ ফল, এবং অগ্নি সমীপে করিলে অনন্ত গুণ ফল লাভ হয়"। * ব্যাস, শঙ্খ প্রভৃতিই অনেক মুনিই অগ্নিসম্মুখে ঈশ্বরোপাসনা প্রশস্ত এবং সর্ব্বপাপনাশক বলিয়াছেন। এক্ষণে দেখিলেন যে সিন্ধুতীরবাসীগণ এবং পারসীকগণ উভয়েই পবিত্রতা, লোকোপকারিতা প্রভৃতি গুণের জন্য অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। † ঋষিদিগের গৃহে অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম্মই অগ্নির সহায়ে সুসম্পন্ন হইত; তাই অগ্নির আরেকটী প্রাচীন নাম গৃহ। গোভিল বলেন,—

"গৃহাঃ পত্নী গৃহ এষো অগ্নির্ভবতীতি"

---

* পাঠক মনে রাখিবেন যে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ভৃগু বা অগ্নিবংশীয়, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি। অগ্নিবংশীয়েরা অগ্নিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করেন।

† কেবল অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বিষয়েই যে হিন্দু ও পারসীকে ঐক্য আছে, তাহা নহে; হিন্দুদিগের আচার প্রথার সহিত পারসীক আচার প্রথার অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পারস্যের প্রাচীন জেন্দ ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, এরূপ অন্য কোন বিদেশীয় ভাষার সহিত দেখা যায় না। এই সকল কারণে পারসীকেরা সিন্ধুতীরবাসী হিন্দু-

"পত্নীকে গৃহা এবং এই অগ্নিকে গৃহ্য বলা যায়।" 'গৃহ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি গৃহায় হিতঃ। মধুচ্ছন্দা ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তটীতে কেমন সরল প্রাণে বলিতেছেন,—'সচস্বানঃ স্বস্তয়ে'—হে অগ্নি! মঙ্গলার্থে, আমাদিগের নিকট সমবেত হও। *

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিংড়ীমাছের রাম্‌তা।

—০*০—*০*—০*০—

উপকরণ।—ঘি-ওয়ালা চিংড়ী ছয়টা (ওজনে প্রায় আধসের), দই এক পোয়া, পেঁয়াজ আধ ছটাক, আদা আধ তোলা, হলুদ বাটা আধ তোলা, দুটি শুক্নালঙ্কা বাটা, জীরা মরিচ বাটা সিকি তোলা, নুন প্রায় পোন তোলা, আলু এক ছটাক, ঘি এক ছটাক, জল তিন ছটাক, কাঁচালঙ্কা দুটি, দারচিনি দুয়ানি ভর, ছোট এলাচ দুটি, লবঙ্গ তিন চারটি।

জাতির উপনিবেশ বা নিকট শাখা বলিয়াই বোধ হয়। জেন্দ শব্দটাই এই মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। ভাষাতত্ত্বের নিয়মালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একটী শব্দ ভাষা হইতে ভাষান্তরে পরিভ্রমণকালে অক্ষররূপ পরিচ্ছদের কতক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সময়ে শব্দাক্ষরগুলি নিজ নিজ পরিচিত অপর কতকগুলি অক্ষরকে আপনার স্থানে আহ্বান করে; যেমন স, জ, হ, ইহারা পরস্পরের স্থানে পরস্পরকে আসন দিয়া থাকে। 'সপ্তাহ' 'হপ্তাহ' হইয়াছে, সংস্কৃত 'সোম' শব্দ জেন্দ ভাষায় 'হোম' হইয়াছে এবং এই একটী কারণে সংস্কৃত 'হরিদ্রা' শব্দ পারস্য ভাষায় 'জরদ' এবং সংস্কৃত 'হোতা' জেন্দ ভাষায় 'জোতা' আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রমাণে জেন্দ শব্দটী 'সিন্ধু' [হিন্দু] শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। এদিকে সিন্ধু শব্দ হইতে যেমন হিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অন্যত্র জেন্দ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

* এই প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রে (১৩০৪ সালে বৈশাখ সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রণালী।—পেঁয়াজ, হলুদ, শুকনালঙ্কা, জীরামরিচ মিহি করিয়া পিষিয়া লও। আদার অর্দ্ধেকটুকু পিষিতে দাও। অর্দ্ধেকটুকু কুঁচাইয়া রাখ। কাঁচা লঙ্কা চিরিয়া রাখ। আলু কুচি করিয়া রাখ।

ফ্রাইপ্যানে বা 'তৈ'য়ে * এক কাঁচ্চা ঘি চড়াইয়া তাহাতে আলুগুলি ছাড়। আলুগুলি ঘিয়ে আধসিদ্ধ হইয়া আসিলে দেড় ছটাক জল দিবে। জল মরিয়া বেশ রস-রস থাকিতেই নামাইয়া ঢালিবে। ইহা তিন চার মিনিটের মধ্যেই হইয়া যাইবে।

আবার ফ্রাইপ্যানে প্রায় তিন কাঁচ্চা ঘি ঢালিয়া তাহাতে চিংড়ীমাছগুলি ঢাল (চিংড়ীমাছের দাঁড়া ও গায়ের খোসা ছাড়াইয়া রাখিবে। মাথার খোলাটা কেবল থাকিবে)। বেশ ভাজা ভাজা করিয়া কষ। যখন দেখিবে মাছের ভিতর বেশ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তখন নামাইবে। এখন চিংড়ীগুলার মুড়ার খোলা খুলিয়া ফেল। মুড়া আস্ত রাখিয়া মাছগুলি চাকা চাকা করিয়া কাট। এই ঘিয়ে গরম মশলা ছাড়। গরম মশলা ফুট-ফাট করিলে, পেষা মশলা তাহাতে ছাড়িবে। ভাজিয়া মশলাকে বেশ লাল কর, দুতিন বার জলের ছিটাও দিবে। মিনিট পাঁচ সাত পরে সমুদয় দই ঢালিয়া দাও। নুন, আদার কুঁচি ও কাঁচালঙ্কা দাও। তাহারপরেই মাছ ও আলু ছাড়। দইয়ের বাটী ধুইয়া দেড় ছটাক জলও দিবে। ইহা মিনিট সাত আট ফুটিলেই নামাইয়া ফেলিবে; অর্থাৎ দয়ের জলটা মরিয়া গেলেই নামাইবে। যদি দইয়ে কম টক্ থাকে ইচ্ছামত একছড়া নূতন তেঁতুল পূর্ব্বোক্ত দেড় ছটাক জলে গুলিয়াও দিতে পার।

ভোজনবিধি।—ইহা ভাত, লুচি পরোটা প্রভৃতির সঙ্গেই খাইতে পারা যায়।

ব্যয়।—চিংড়ী তিন আনা, দই তিন পয়সা, ঘি চারি পয়সা, আলু ও অন্যান্য মশলা আন্দাজ দুতিন পয়সা। সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে পাঁচ আনার ভিতরে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

---

* ভাজিবার দেশীয় পাত্র বিশেষ উহা দেখিতে ফ্রাইপ্যানের মত। সচরাচর মাটীর তৈয়ারী হইয়া থাকে।

কোপ্তা পুডিং।

উপকরণ।—ভেটকীমাছ একটা ওজনে প্রায় আধ সের, গোলমরিচ গুঁড়া সিকি তোলা, গরম মশলার গুঁড়া সিকি তোলা (ছোট এলাচ দুটি, দারচিনি দুয়ানি ভর, লঙ্গ তিন চারিটা এই পরিমাণে গুঁড়াইয়া লইবে), শুক্না লঙ্কা দুতিনটি, নুন প্রায় এক তোলা, ময়দা দেড় ছটাক, দুধ তিন ছটাক, আদা আধ তোলা, ডিম তিনটী, নেবু একটি, পেঁয়াজ আধ পোয়া, বাগানে মশলা দুতিন ডাল (বাগানে মশলা অভাবে ধনেশাক ও পুদিনা), জল প্রায় তিন পোয়া, ঘি আধ পোয়া, কাঁচা লঙ্কা একটি।

প্রণালী।—ভেটকী মাছটীর বেশ করিয়া আঁশ ছাড়াইয়া ফেল। লেজা ও মুড়া আলাদা রাখ। মাঝের কাঁটাটী হইতে দুপিঠের শাঁস ভাগ লম্বাভাবে কাটিয়া বাহির কর। এই মাছ কাঁটা হইতে ছাড়াইবার সময় বঁটি অপেক্ষা ছুরিতে অধিক সুবিধা হয়। মাছ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেল। এবারে ছুরি দিয়া মাছের ছাল ছাড়ইয়া ফেল। মাছ হামানদিস্তায় কুটিয়া লও।

আধ ছটাক পেঁয়াজ কুচি করিয়া রাখ,—ইহা ভাজিতে হইবে। এক কাঁচ্চা পেঁয়াজ কিমা (অর্থাৎ খুব ছোট ছোট কুচি) করিয়া আলাদা রাখ। আরও এক কাঁচ্চা পেঁয়াজ চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখ। আদার খোসা চাঁচিয়া চাকা কাটিয়া রাখ। শুক্না লঙ্কা আলদা কুটিয়া রাখ।

ফ্রাইপ্যান বা তৈ চড়াইয়া তাহাতে এক কাঁচ্চা ঘি দাও; মাছ ছাড়। তিন চার মিনিট নাড়িয়া মাছটা কষা হইলে নামাও। মাছের সহিত শুক্না লঙ্কা গুঁড়া, দুআনি ভর গরম মশলার গুঁড়া, দুয়ানি ভর গোলমরিচ গুঁড়া প্রায় ছয় আনি ভর নুন মিশাইয়া রাখ। আবার আধ ছটাক ঘি চড়াইয়া কুঁচা পেঁয়াজগুলি ভাজ। তিন চার মিনিটের মধ্যে হইয়া যাইবে। এখন মাছের সহিত ভাজা পেঁয়াজ-গুলিও মিশাইয়া মিহি করিয়া পিষিয়া লও। মাছ পেষা হইলে পর আবার ইহাতে দুয়ানি ভর গরম মশলার গুঁড়া এবং দুয়ানি ভর গোলমরিচগুঁড়া,

কিমা পেঁয়াজগুলি মাখিয়া লও। বারটী চেপ্টা ধরণের কোপ্তা কর। ফ্রাইপ্যানে দেড় ছটাক ঘি চড়াইয়া কোপ্তাগুলি ভাজ; মিনিট ছয় সাতের ভিতর হইয়া যাইবে।

এইবারে কাষ্টার্ড প্রস্তুত কর। দেড় ছটাক ময়দা, আধ পোয়া জলে গোল। ফেটাইয়া মিশ্রিত করিয়া লও, যেন ময়দার ডেলা জমিয়া না থাকে। দুইটী ডিম ভাঙ্গিয়া ইহাতে দাও। ফেটাইয়া ফেটাইয়া যখন ফেনার মত বাহির হইতে থাকিবে তখন তাহাতে তিন ছটাক দুধ ঢালিয়া দিবে। ইহাও নাড়িয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া ফেল। এটা এখন রাখিয়া দাও।

মাছের মুড়া, ল্যাজা, কাঁটা প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বে অলাদা করিয়া রাখিয়াছিলে সেই সমুদয়ের সুরুয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। একটী হাঁড়িতে আড়াই পোয়া জল চড়াও। এই জলে চাকাকাটা পেঁয়াজ ও আদা, বাগানে মশলা (অভাবে ধনেশাক ও পুদিনার শাক), কাঁচা লঙ্কা ছাড়। এই সঙ্গে একটি যে ডিম বাকী আছে সেটিও ইহাতে সিদ্ধ করিতে দাও।

প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মিনিট পরে যখন দেখিবে সুরুয়া বেশ শাদা হইয়াছে তখন হাতে করিয়া দেখিবে চট্ চটে হইয়াছে কি না। আধ পোয়া কি তিন ছটাক থাকিতে এই সুরুয়া নামাইতে হইবে। সুরুয়া একটি কাপড়ে করিয়া ছাঁকিয়া ফেল। দুধ ও ডিমের গোলা বেশ করিয়া নাড়িয়া লও যেন ময়দাটা নীচে জমিয়া না থাকে। এইটা সুরুয়াতে ঢালিয়া দাও। ইহাতে প্রায় আধ তোলা নুন দাও। এইবারে সমস্ত মিশ্রিত জিনিষটা হাঁড়ি করিয়া আগুণে চড়াইয়া দাও। খুন্তি দিয়া ক্রমাগত এক দিকে হিলাইতে অর্থাৎ নাড়িতে থাক। মিনিট দশের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইবে। ইহাই 'কাষ্টার্ড' প্রস্তুত হইল।

একটী সুপ প্লেটের ন্যায় গাঢ় পাত্রে চামচে করিয়া এই কাষ্টার্ড তুলিয়া এক স্তর দাও। ইহার উপরে কোপ্তাগুলি বিছাইয়া দাও। তাহার উপরে নেবুর রস ছড়াইয়া দাও। এবং সিদ্ধ ডিমটীর খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা কাটিয়া কোপ্তার উপরে সাজাইয়া দাও। এখন অবশিষ্ট কাষ্টার্ড ইহার উপরে ঢালিয়া দাও।

ভোজনবিধি।—ইহা পাঁউরুটীর সঙ্গে খাইতে ভাল লাগে।

ব্যয়।—ভেটকীমাছ দুই আনা, ময়দা প্রায় এক পয়সা, দুধ দুই পয়সা, ঘি দুই আনা, লেবু দুই পয়সা, আর অন্যান্য মশলা দু তিন পয়সায় ধরিয়া লও। সাড়ে পাঁচ আনার ভিতরে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

দুধ কমলা।

উপকরণ।—দুধ একসের, বাদাম আধ ছটাক, পেস্তা এককাঁচ্চা, মিষ্টি কমলা লেবু দুইটি, চিনি দেড় ছটাক।

প্রণালী।—বাদাম ভিজাইয়া খোসা ছাড়াইবে। বাদামের অর্দ্ধেকগুলি লম্বা দিকে কুচি করিবে, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধেকগুলি অতি মিহি করিয়া পিষিয়া লইবে। পেস্তাও ভিজাইয়া খোসা ছাড়াইবে, তারপর লম্বা দিকে কুচি করিয়া কাটিবে।

কমলা লেবুর কোয়া বাহির কর। প্রত্যেক কোয়ার ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিয়া আলাদা রাখিয়া দাও।

এখন দুধ আওটাইয়া প্রায় দেড় পোয়া কর। মিনিট পনের কি কুড়ির ভিতরে হইয়া যাইবে। তার পরে চিনি দিবে। দু এক বার ফুটিলেই নামাইয়া একটি বাটীতে ঢালিয়া ফেল। এই দুধে এখন পেস্তাকুচি ও বাদামকুচি দাও। পরে বাদাম বাঁটা দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া দুধের সহিত মিলাইয়া ফেল। ক্রমাগত হাতা দিয়া নাড়িবে, যেন সর না পড়ে। অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে কমলা লেবুর শাঁস দিয়া, নাড়িয়া দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। ইহা এখন ওজনে কমবেশী প্রায় আড়াই পোয়াটাক হইবে।

গুণাগুণ।—ইহা অতি পুষ্টিকর, ও পেট ঠাণ্ডা রাখে।

ভোজনবিধি।—ভাত এবং লুচি দুয়েরই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যয়।—দুধ প্রায় চোদ্দ পয়সা, বাদাম চার পয়সা, পেস্তা দু পয়সা, কমলা নেবু চার পয়সা, চিনি প্রায় দু পয়সা। সাড়ে পাঁচ আনার মধ্যে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

গাজীপুর ও গাধিপুর।

(গাজীপুর সম্বন্ধে মুসলমান ও হিন্দু আখ্যায়িকা)

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে জগৎ।" চক্রের ন্যায় জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাহা গ্রাম ছিল নগর হইয়াছে, যাহা নগর ছিল গ্রাম অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, যাহা এক জাতির অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা অপর জাতির করতলগত হইয়াছে; এইরূপে পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে থাকিয়া জগৎ সতত বিচিত্র আকার ধারণ করিতেছে। এই ভারতে হিন্দু আর্য্যেরা কত না কাণ্ড করিল, পরে মুসলমানেরা আসিল, এক্ষণে ইউরোপীয়েরা আসিয়া মহা ব্যাপার বাধাইয়াছে। এক্ষণে ভারত ইউরোপীয় যুগ। এ যুগে বসিয়া অতীত ভারতের যুগে উপনীত হইয়া তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব সমূহ উদ্ধার করা বড়ই কঠিন কার্য্য। কবি কালিদাস রঘুবংশ লিখিবার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

কবি কালিদাসের কথায় সায় দিয়া আমরাও বলিতেছি যে সূত্র যেমন মণি-বেধকারি কৃত ছিদ্র দ্বারা মণি মধ্যে প্রবেশ করে, আমরাও তদ্রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের নির্ম্মিত বাক্যরূপ দ্বার দিয়া গাজীপুরের পুরাবৃত্তে এবং সেই সঙ্গে চন্দ্রবংশীয় ইতিহাসে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইব।

গাজীপুরের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান গাজীপুর সহরের প্রতিষ্ঠাতা কে? কাহার নামে গাজীপুর নাম হইল এই সকল কথা মনে জাগিয়া উঠে। গাজীপুর কথাটী দেখিয়া সহজেই অনেকের মনে হইতে পারে যে, বোধ হয় গাজীপুর নাম কোন গাজীপীরের নাম হইতে হইয়া থাকিবে। এবং সেই কারণে গাজীপুরের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান, যে হেতু গাজী নাম মুসলমান। কিন্তু প্রকৃত কারণ তাহা নয়, গাজীপুরের প্রাচীন নাম গাধিপুর। ইহা গাধিরাজার স্থাপিত। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্তানুসার হিন্দুরা ইহাকে গাধিপুর বলিতে চায়, কিন্তু মুসলমানেরা তাহা বলিতে চায় না, তাহারা বলে এই সহর গাজীমিয়ার স্থাপিত, তাই গাজীপুর নাম হইয়াছে। এ তর্কের মিমাংসা কে করিবে? মুসলমানদের স্বপক্ষে মীমাংসার জন্য তাহাদের উদ্ভাবিত গাজীপুরের একটা পাকাপাকি ইতিবৃত্তের নজিরও প্রস্তুত আছে। কিন্তু হিন্দুদের সেরূপ পাকাপাকি নজীর নাই। সে নজীর রাখিবার হিন্দুদের তেমন কোন আবশ্যক হয় নাই, কারণ চেনা বামুনের পৈতার আবশ্যক নাই। হিন্দুরাজ্যে বরাবর এটা সকলেই জানিয়া আসিতেছিল যে গাজীপুর জেলাটী গাধিপুর বা গাধিরাজের রাজ্য ছিল। মুসলমানেরা আসিয়া তাড়াতাড়ি সম্ভবতঃ গাধিপুর সহরটী নিজেদের ধর্ম্মাধিকারভুক্ত করিয়া লইবার জন্য তাহারা গাধিপুরকে মিয়াগাজীর ইতিবৃত্তে সজ্জিত করিয়া তাহার নামে গাজীপুর নামকরণ করিয়া থাকিবে। মুসলমানদিগের ইতিবৃত্তে লেখা আছে,—

"মান্ধাতা বলিয়া এক রাজা ছিলেন, তিনি দিল্লীর শেষ হিন্দু অধিপতি, এবং আজমীরের রাজা ছিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজ বা পিথোর রায়ের অন্যতম বংশধর ছিলেন। এই মান্ধাতারাজের এক সময়ে মহাব্যাধি হয়, তাহাতে তিনি সেই রোগজনিত পাপের

প্রায়শ্চিত্তার্থে কটকে যাইয়া জগন্নাথ দর্শনে মনস্থ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রস্থান করিলেন। খুব দলবল লইয়া যাইতেছেন; মধ্যপথে গাজীপুর হইতে চার ক্রোশ দূরবর্ত্তী, গঙ্গাতীরে অবস্থিত, এবং বর্ত্তমান ঘোষপুর গ্রামের সমীপবর্ত্তী কাটোটি নামক স্থানে একটা জলাশয় দেখিলেন; সেখানে তাঁহার স্নান করিবার ইচ্ছা হইল, তিনি স্নান করিলেন। বলিতে কি, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার সেই স্নানে মহাব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেল। আরোগ্য লাভানন্তর রাজা মান্ধাতার এখন নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সংবাদ পাইলেন, যে তাঁহার এই অনুপস্থিতিকালে মুসলমানেরা তাঁহার দেশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।—তখন তাঁহার সেখানে যাইবার আর ইচ্ছা হইল না, যেখানে তিনি রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, সেই স্থানেই—সেই কাটোটিতেই তাঁহার নব রাজধানী স্থাপনের মানস করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং নিজে তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশের কর্ত্তা হইলেন।

"রাজা মান্ধাতার পুত্র ছিল না, এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। এই ভাইপোর দোষে আবার এ রাজ্যটীও তিনি হারাইয়াছিলেন।—এই ভ্রাতুষ্পুত্রটী একদিন তাঁহার দেশে দেখিলেন, একটি মুসলমান রমণী তাহার একটি ছোট অতি সুন্দরী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। পথে তাহাকে দেখিয়া তাহার সেই কন্যাটি হরণ করিবার স্পৃহা বলবতী হইল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, যবন রমণীকে আনাইয়া তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সেই কন্যাটীকে কাড়িয়া লইলেন—মনের অভিপ্রায় এই যে যখন সে বড় হইবে, বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইবে,-তখন তাহাকে বিবাহ করিবেন। রমণী মহা ক্ষতিগ্রস্তা হইলেন, তাঁহার কন্যা ফিরিয়া পাইবার জন্য রাজপুত্রকে যথেষ্ট সাধ্য সাধনা করিলেন, কত কাকুতি মিনতি করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, শেষে নিকটবর্ত্তী এক মুসলমান অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করিতে গেলেন। অধ্যক্ষ দেখিলেন যে, রাজা মান্ধাতা তাঁহার তুলনায় প্রভূত বলবান, মান্ধাতাকে আক্রমণ করা তাঁহার মত লোকের কর্ম্ম নয়, তাই তিনি সেই রমণীকে দিল্লীতে যাইতে বলিলেন; মুসলমান রমণী দিল্লীতে গেল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, যে দিল্লীপতি মহম্মদ টোগলক দাক্ষিণাত্যে (দক্ষিণ ভারতবর্ষে) যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইয়াছেন, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোজ সা টোগলককে প্রতিনিধি (Deputy)

রূপে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তখন সেই রমণী সেই ফেরোজ সা টোগলকের কাছেই কোনরূপে কথাটা ওঠাইলেন। তিনি শুনিয়া বৃদ্ধাকে ধর্ম্মযোদ্ধা—ধর্ম্মবীর চল্লিশ জন যোদ্ধা দরবেশের দলের কাছে যাইতে বলিলেন। বৃদ্ধা তদনুসারে তাহাদের কাছে গেল; তাঁহারা বলিলেন, তাহারা ইহার শোধ লইতে পারে যদি প্রখ্যাত সাম্প্রদাধ্যক্ষ মসাউদ তাহাদের নেতাস্বরূপ হয়। বৃদ্ধা বলিল সে জানে না কিরূপে তাঁহার কাছে যাইতে পারিবে; তাহাতে তাহারা এই ভবিষ্যৎ বাণী বলিলঃ—একদিন রাত্রিতে একটি ভয়ানক ঝড় আসিয়া মসাউদের ছাড়া আর সকল অধ্যক্ষের তাঁবু ভূমিসাৎ করিবে; এবং ঝড় থামিয়া গেলে বুড়ি দেখিতে পাইবে যে তিনি (মসাউদ) প্রদীপের আলোর ধারে পবিত্র কোরাণ পাঠ করিতেছেন।

"ভবিষ্যত বাণী ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা দরবেশদিগের সঙ্কেতানুযায়ী মসাউদকে ঠিক বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কাছে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। বৃদ্ধা মসাউদের কাছে উপস্থিত হইয়া নালিশ করিল। মসাউদ সেই রমণীর নালিস মঞ্জুর করিয়া দরবেশদিগের কর্ত্তা হইয়া মান্ধাতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দণ্ডদিবার জন্য চলিলেন; সঙ্গে তাঁহার সাত পুত্র চলিল এবং অন্যান্য যোদ্ধারাও চলিল—গঙ্গার দক্ষিণধার দিয়া চলিল। চলিতে চলিতে তাঁহারা সকলে মান্ধাতার কেল্লায় বিপরীত দিকে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে, মসাউদের সঙ্গে এক জন মুসলমান ফকিরের সাক্ষাত হইল। এই ফকিরটী তথাকার হিন্দুদিগের অনুদারতা ও অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস বাধ্য হইয়া লুকাইয়া রাখিত। এই ফকির এই যুদ্ধযাত্রায় ঈশ্বরের কাছে আশীষ ভিক্ষা করিল, কিন্তু মসাউদকে কাফেরের ক্ষমতার কথা, বলিয়া সাবধান করিয়া দিল, বলিয়া দিল যে এত অল্প বল লইয়া তাহার সঙ্গে পারা অসম্ভব। ফকির পরামর্শ দিল যে হঠাৎ যাইয়া রাজাকে আক্রমণ করাই বিধেয়। মসাউদ ফকিরের পরামর্শমত দলবল পশ্চাতে রাখিয়া শুধু তাঁহার পুত্রগণকে ও চল্লিশ জন ধর্ম্মযোদ্ধাকে লইয়া রাত্রিতে গঙ্গা পার হইলেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই তাহারা রাজার উপর সহসা আক্রমণ করিল। এই সময় রাজা তাঁহার প্রত্যহ কৃত্যানুসারে গঙ্গার কাছে কুঞ্জবনে তাঁহার লোকদিগের কুস্তি (মল্লক্রীড়া) দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় রাজা সহসা আক্রান্ত হইয়া নিহত হই-